

শ্যামল ঘোষ

তিব্বতি পুঁথি

বিনয়বাবুর জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে বই। পড়ার অভ্যাসটা পেয়েছেন উত্তরাধিকারসূত্রে ... বাবা ছিলেন অধ্যাপক, মা নামকরা স্কুলের শিক্ষিকা এবং দুজনেই নিজের নিজের বিষয়ের বাইরেও যথেষ্ট পড়াশোনা করতেন। ঠাকুরদারও বই পড়ার নেশা যে ছিল সেটা বাড়িতে তাঁর আমলের বইয়ের সংগ্রহ দেখলেই বোঝা যায়। পুরনো সেগুন কাঠের আলমারিতে ব্রাউন পেপারে সযত্নে মলাট দেওয়া মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শন, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, বাল্মীকি রামায়ণের বাংলা অনুবাদ, অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা থেকে আরম্ভ করে গ্রহরত্নের উপকারিতা, সরল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ... কী নেই তাতে! বিনয়বাবুর কাছে ঐ আলমারিটা ছিল একটা গুপ্তধনের মতো।

ঠাকুরদার মৃত্যু হয়েছিল তাঁর জন্মের আগেই। তবে বাবা-মা দুজনেই পুস্তকপ্রেমী হওয়ার জন্য পুরনো বইগুলোর পাতা হলদে হয়ে গেলেও মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছে।

বিনয়বাবু বই শুধু পড়তে ভালোবাসেন তা নয়, দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করা ওঁর একটা শখ। কলকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গার ধারে তাঁদের বিশাল বাড়িতে দোতলার দুটো বড় ঘরের দেওয়াল জোড়া শুধু বইয়ের আলমারি। একটা ঘরের মাঝখানে আরামদায়ক সোফা, জানলার সামনে বিনয়বাবুর পড়ার টেবিল চেয়ার। দুটো ঘরের মাঝে একটা দরজা। এছাড়াও নীচের একটা ঘরেও ভর্তি বই। তবে বিনয়বাবুর চোখে যে বইগুলো বেশি মূল্যবান সেগুলো দোতলার ঘর দুটোতেই থাকে। বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ির অভাব নেই বিনয়বাবুর। নিজেও পনেরো বছর মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করে প্রচুর টাকা জমিয়েছেন। একচল্লিশ বছর বয়সে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে স্ত্রী পুত্র সমেত দেশে ফিরে এসেছেন। মা-বাবাও তাই চাইছিলেন, দুজনেরই বয়স হয়েছে, ছেলে বউ নাতি কাছে থাকবে এটাই তাঁদের শেষ বয়সের আনন্দ। তবে বাড়ির

কাছের স্কুলগুলো বউমার তেমন পছন্দ না হওয়ায় কলকাতায় একটি দামী ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি করা হয় বিনয়বাবুর একমাত্র পুত্র সৌনককে যাকে সবাই সোনু বলেই ডাকে। বাড়ি থেকে যাতায়াত করা সম্ভব নয় বলে বিনয়বাবুর স্ত্রী সুনন্দা ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় একটা ফ্ল্যাটে থাকেন স্কুল থেকে হাঁটাপথের দূরত্বে। শনি রবিবার স্কুলের ছুটি থাকে, তখন ওরা দুজনে চুঁচুড়ায় চলে আসেন। আবার সোমবার সকালে চলে যান। এই ব্যবস্থা সবার পছন্দ। সুনন্দার বাবা-মা-দাদা-বৌদি কলকাতায় ওদের ফ্ল্যাটের কাছেই থাকেন, তাই দরকারে অদরকারে তাঁদের সবসময়ই পাশে পাওয়া যায়। বিনয়বাবু সপ্তাহের মধ্যে দিন দুয়েক কলকাতায় কাটান। বাকিটা চুঁচুড়ার বাড়িতে নিজের বইয়ের জগতে মগ্ন থাকেন।

বিনয়বাবু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের খোঁজ পেলে কলকাতার বাইরে যেতেও রাজি। এমনিতে কলেজ স্ট্রিট বা মুম্বইয়ের ফ্লোরা ফাউন্টেন এলাকার ফুটপাথ তাঁর চষে ফেলা আছে। পরিচিত সব বইয়ের দোকান তাঁর এই নেশার কথা জানে। তাদের সন্ধানে কিছু থাকলে বিনয়বাবুর কাছে খবর পৌঁছে যায়। বিশেষ করে বিনয়বাবুর নজর থাকে পুরনো বনেদি বাড়ির ওপর, যেখানে বর্তমান প্রজন্ম হয়তো বাড়ি ভেঙে প্রোমোটারদের হাতে দিয়ে দিচ্ছে ... তার আগে পুরনো আসবাব বইপত্র বিক্রি করার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

সোনুর ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের গরমের ছুটি এ বছর একটু দেরি করে শুরু হয়। ঠিক হল, ঐ সময় নেপাল যাওয়া হবে সবাই মিলে। বিনয়বাবু ও সুনন্দার বাবা-মাও যাবেন। ঠিক হল তিনদিন কাঠমান্ডুতে থেকে পোখারা যাবেন সবাই। দুদিন সেখানে কাটিয়ে আবার একদিন কাঠমান্ডুতে থেকে কলকাতায় ফেরা হবে। সবাই খুব খুশি, অবশ্যই কারণগুলো আলাদা আলাদা। বিনয়বাবুর মা ও শাশুড়ির অনেক দিনের ইচ্ছে পশুপতিনাথ দর্শন করার। বিনয়বাবুর বাবার আগ্রহ পাটান, ভক্তপুর ও কাঠমান্ডুর অন্য সব ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখার। বাকিরা, বেড়ানো হবে ... নতুন জায়গা দেখা হবে ... সেই আনন্দে মগ্ন। বিনয়বাবুও বেড়াতে ভালোবাসেন, তবে তাঁর আর একটা আকর্ষণ আছে। বিনয়বাবুর এক নেপালি বন্ধু, প্রফেসর অমাত্য তাঁকে একবার গল্প করেছিলেন যে কাঠমান্ডু শহরের থামেল অঞ্চলে আছে এক বইয়ের দোকান যেখানে অনেক সময় পুরনো, দুষ্প্রাপ্য বই পাওয়া

যায়। দোকানটা বিদেশিদের খুব প্রিয়। দোকানের মধ্যেই একটা ক্যাফেটারিয়া আছে, যেখানে বসে কফি সহযোগে বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অনেক বইপ্রেমী ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন।

কাঠমান্ডুতে পৌঁছে দেখা গেল আকাশের মুখ ভার, দু-চার পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, হালকা একটা ঠান্ডা ভাব। হোটেলে পৌঁছে সবাই চায়ের অর্ডার দিয়ে পরের দিনগুলোয় যেসব জায়গা যাওয়া হবে তার প্ল্যান করতে বসে গেল। তখনও সন্ধ্যার কিছু দেরি আছে। বিনয়বাবু হোটেলের রিসেপশনে বলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেললেন। ইতিমধ্যে ঐ বইয়ের দোকানে ফোন করে জেনে নিয়েছেন তারা কতক্ষণ খোলা রাখবে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে আর ঠান্ডা হাওয়া চলছে বলে কেউ বেরোতে রাজি হল না। কাঠমান্ডু উপত্যকায় এটা মাঝে মাঝেই হয়, সারাদিন হয়তো বেশ গরম, বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে তাপমাত্রা হঠাৎ করে নেমে যায়। বিনয়বাবু একাই একটা হালকা জ্যাকেট চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

থামেলের রাস্তা খুব চওড়া নয়। সন্ধ্যার দিকে ওখানকার রেস্তরাঁগুলোতে খুব ভিড় হয়। যার জন্য রাস্তায় বেশ যানজট। বইয়ের দোকানে পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে পৌঁছোনো সম্ভব হল না। কিছুটা দূরে গাড়ি রেখে বাকি পথটা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে হেঁটে পৌঁছে গেলেন বিনয়বাবু। পৌঁছে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। বিরাট দোকানের সামনে অনেক লোকের ভীড়, একটু আগেই নাকি আগুন, লেগেছিল সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে। একজন কর্মচারীর নজরে পড়ায় তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু জল ঢালার জন্য বেশ কিছু বই নষ্ট হয়েছে। যে দিকটায় আগুন লেগেছিল সেখান থেকে তাড়াহুড়ো করে বই সরিয়ে অন্যদিকে স্তূপাকৃতি করে রাখা আছে। ফলে সে দিকের বইয়ের আলমারির সামনে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। দুজন পুলিশের লোকও চোখে পড়ল। বিনয়বাবু ভেবে দেখলেন, তিনি ফোন করেছেন ঘণ্টা দুয়েক আগে। ম্যানেজার স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেছেন। তার মানে এইটুকু সময়ের মধ্যেই ঘটনা ঘটেছে। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হতে মনে হল তিনি খুবই বিচলিত। সেটাই স্বাভাবিক ... বইয়ের দোকানে আগুন লাগলে কী ভয়াবহ কাণ্ড হতে পারে ভেবে বিনয়বাবুও মনে মনে শিউরে উঠলেন। তখনই ঠিক করে নিলেন বাড়ি

ফিরেই একতলা দোতলার জন্য দুটো ফায়ার এক্সটিংগুইজার কিনতে হবে। বইয়ের দোকানে তখন বাইরের কোনো খরিদ্দারকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বিনয়বাবুর মুখে প্রফেসর অমাত্যর নাম শুনে ম্যানেজার খুব খাতির করে ওঁকে ভিতরে ডেকে নিলেন। বললেন "আপনি প্রফেসর সাহেবের বন্ধু, অত দূর থেকে এসেছেন, আপনার ব্যাপার আলাদা। আপনি ভিতরে এসে বইপত্র দেখুন। আমি একটু সামলে নিয়ে আসছি। ইচ্ছে করলে আপনি পিছনের ক্যাফেটারিয়ায় বসে চা কফি খেতে পারেন।" দোকানটা আধুনিক বইয়ের দোকানের মতো সাজানো গোছানো না হলেও, বইয়ের ভাণ্ডার কলকাতা-ব্যাঙ্গালোর-মুম্বাইয়ের অনেক নামজাদা দোকানের কাছে ঈর্ষণীয় লাগতে পারে। খুঁজতে খুঁজতে বিনয়বাবু পেয়ে গেলেন একটি বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত বই মিলিন্দপন্থর'র ইংরেজি অনুবাদ, নেপালের বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের দেবদেবীর উপর লেখা একটি সচিত্র বই এবং আরও তিন-চারটে বই। এগুলো উল্টে পাল্টে দেখার জন্য ক্যাফেটারিয়ায় এসে বসলেন বিনয়বাবু কফির অর্ডার দিয়ে। আসলে নেপালের দুষ্প্রাপ্য বই খোঁজার পিছনে বিনয়বাবুর মনে একটা গোপন আশা আছে। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, চর্যাপদ, আবিষ্কার হয়েছিল নেপালেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজকীয় সংগ্রহশালায় পেয়েছিলেন সেইসব পুঁথি, যার থেকে বাংলা ভাষার বয়স যে অন্তত হাজার বছর তা জানা সম্ভব হয়েছে। বিনয়বাবুর মনে একটা আশা আছে যদি ঐরকম কোন পুরনো পুঁথি তাঁরও হাতে এসে পড়ে।

ঘণ্টা খানেক পর খানিকটা সামলে নিয়ে ম্যানেজার যখন এলেন তখন বিনয়বাবু বললেন তাঁর উদ্দেশ্যের কথা "যদি আপনাদের কাছে কোনো পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই বা হাতে লেখা পুঁথি থাকে তা কিনতে আমি আগ্রহী। অবশ্যই আসল জিনিস হওয়া চাই। পছন্দ হলে আমি উপযুক্ত দাম দেব।" নেপালি ম্যানেজার বললেন "আপনি কাল আসতে পারবেন? আজ তো দেখতেই পারছেন কী অবস্থা। কাল সন্ধ্যার সময় এলে আমি খুঁজে রাখতে পারি।" বিনয়বাবু বললেন — "আমি তো খুব কম সময় হাতে নিয়ে এসেছি। সঙ্গে আমার পরিবারের সবাই আছেন। তাদের ছেড়ে বারবার আসা মুশকিল। দেখুন না যদি কিছু থাকে।" ম্যানেজার একটু চিন্তা করে বললেন — "আজকে সকালে আমার হাতে একটি পুঁথি এসেছে, এক বিদেশি, হিপি

ধরনের পোশাক-আশাক, বিক্রি করে গেছে। এরা অনেকেই এরকম আসে, নেশাভাঙ করে, টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে ক্যামেরা, ঘড়ি যা থাকে বিক্রি করে যায়। এ লোকটা একটা পুঁথি নিয়ে এসেছিল, মনে হয় আসল, সম্ভবত প্রাচীন তিব্বতি হরফে লেখা। কিন্তু এ ধরনের কিছু আমি আগে দেখিনি। ও আমার কাছে একশ ডলার চাইছিল, শেষ পর্যন্ত নেপালি তিন হাজার টাকায় আমি কিনেছি ... মানে ত্রিশ ডলারও নয়”। বিনয়বাবু পুঁথিটা দেখতে চাইলেন।

বইয়ের দোকানের ম্যানেজার ভিতরে গিয়ে পুঁথিটা নিয়ে এলেন। একটা বিবর্ণ সিল্কের কাপড়ে মোড়া, সিল্কেরই রশি দিয়ে বাঁধা জিনিসটা এনে বিনয়বাবুর সামনে টেবিলের ওপর রেখে বললেন “একটা কথা আপনাকে আগেই বলে দেওয়া উচিত ... পুঁথিটা সম্বন্ধে কিন্তু আমি কিছুই জানি না। সাধারণত এরকম কিছু আমাদের কাছে এলে আমরা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিই। তারপর তার প্রাচীনত্ব এবং দুষ্প্রাপ্যতার ওপর দাম ঠিক করা হয়। এক্ষেত্রে সেসব কিছু করার সময়ই পাইনি আমি। আজ সকালে পুঁথিটা আমার কাছে বিক্রি করতে এসেছিল, একঝলক দেখে আমার পুঁথিটা অন্যরকম মনে হয়। এই লাইনে আমার অভিজ্ঞতা প্রায় তিন দশকের। কাজেই কিছুটা তো ধারণা আছে। বলতে পারেন খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই এটা কিনে ফেললাম।”

কথা বলতে বলতে রশির গিঁট খুলছিলেন ম্যানেজার। বিনয়বাবু সেদিকেই তাকিয়েছিলেন। বিবর্ণ হয়ে গেলেও সিল্কের কাপড়ের ওপর সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি তাঁর চোখ এড়ায়নি। বিনয়বাবু বললেন “কীসের ঝুঁকি”? — “মানে ঐ সাহেব তো আমার পরিচিত নয়। জিনিসটা নকল হতে পারে, চোরাই হতে পারে। অবশ্য সে খুব সামান্য টাকার বিনিময়েই দিয়ে দিল আমাকে পুঁথিটা। ওর মনে হল খুব তাড়া ছিল, যেন এটা হাতছাড়া করতেই হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এটা আমার একটু সন্দেহজনক লেগেছে। অবশ্য হতে পারে তার নেশা করার টাকা ফুরিয়ে যাবার কারণেও হয়তো সে ব্যস্ত হয়েছিল। আপনি প্রফেসর সাহেবের বন্ধু, আপনাকে সবকিছু খুলে বলা আমার কর্তব্য।” ভদ্রলোকের সততা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন বিনয়বাবু।

পুঁথি যেমন সাধারণত হয়, দুটো আয়তাকার কাঠের পাটার মাঝখানে তুলোট কাগজ বা ঐ জাতীয় কোনো কাগজের ওপর হাতে লেখা এবং

অলঙ্করণ করা। প্রথমেই যে বিশেষত্ব বিনয়বাবুর চোখে পড়ল তা হল কাঠের পাটা যাকে পুঁথির মলাট বলা যেতে পারে, তার ওপর বুদ্ধ বা অন্য কোনো জাতকের ছবি নেই। সাধারণত তিব্বতি যে সমস্ত পুঁথি দেখা যায় সে সবই বৌদ্ধ। বজ্রযানি হলে বৌদ্ধ দেবদেবীর ছবিও কখনও কখনও দেখা যায়। কিন্তু ওপরের পাটায় খোদাই করা আছে কিছু দুর্বোধ্য চিহ্ন, রং কালচে হয়ে এসেছে। বিনয়বাবুর অভিজ্ঞ চোখে মনে হল বেশ পুরনো।

ভিতরের কাগজগুলো তাঁকে আরও আশ্চর্য করল। ভারতীয় বা তিব্বতি পুঁথি সাধারণত তুলোট কাগজে লেখা হত। তারও আগে গাছের ছাল বা শুকনো তালপাতা সমতল করে তার ওপর লেখা হত। এই পুঁথিটার পাতা দেখে মনে হল কোনো প্রাণীর চামড়া শুকিয়ে তারপর পিটে পিটে পাতলা করা হয়েছে। এ ধরনের কাগজকে পার্চমেন্ট বলা হয়। খ্রিস্টজন্মের অনেক আগে থেকে মিশর, মধ্যপ্রাচ্যে, গ্রীসে এ ধরনের কাগজ ব্যবহার হত কিন্তু এই উপমহাদেশে কখনও ব্যবহার হয়েছে বলে বিনয়বাবু জানতেন না। এই কাগজের ওপর কালচে বাদামি কালিতে যে ভাষায় লেখা, তার সঙ্গে তিব্বতি হরফের কিছুটা মিল আছে। বিনয়বাবু তিব্বতি পড়তে পারেন না, কিন্তু হরফ দেখলে বুঝতে পারেন সেটি তিব্বতি কিনা। তিনি অনুমান করলেন, প্রাচীন তিব্বতি হরফে লেখা এই পুঁথিটা। পুঁথির কয়েকটা পাতায় ছবি আঁকা আছে, সবই ভয়াল দর্শন অদ্ভুত প্রাণীর নয়তো বিকট মুখের ছবি। এছাড়া আর একটা জিনিস তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল, আয়তাকার পাতাগুলোর বাঁদিকে বেশ কিছুটা জায়গা ছেড়ে লেখা হয়েছে। সেখানে অন্য কোনো অজানা ভাষার হরফে কিছু কিছু লেখা। বিনয়বাবু মনে মনে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হল পুঁথিটা সাধারণ নয়।

ইতিমধ্যে ম্যানেজার ফোন করে তিব্বতি জানা এক ভদ্রলোককে ডেকে নিয়েছেন। তিনি দেখে বললেন এ সম্ভবত তিব্বতি হরফের খুব প্রাচীন সংস্করণ, তাঁর পক্ষে এ পড়া সম্ভব নয়। সেই ভদ্রলোক ছবিগুলো দেখে একটু অস্বস্তির সঙ্গে জানালেন, এরকম ছবি তিনি আগে কোথাও দেখেছেন। এগুলো মানুষের অনিষ্টকারি অপদেবতার ছবি। সাধারণত কোনো ধর্মগ্রন্থে এদের ছবি থাকার কথা নয়।

ভারতীয় মুদ্রায় চার হাজার টাকা দিয়ে পুঁথিটা কিনে হোটেলে ফেরার জন্য

বেরোলেন বিনয়বাবু। বাইরে এসে মনে হল একটু দেরি হয়ে গেছে। কাঠমাণ্ডু শহর অন্য জায়গার তুলনায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। রাত দশটায় রাস্তা বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার এর মধ্যে দুবার মোবাইলে মিসড কল দিয়েছে। বেশ কিছুটা হেঁটে যেতে হল যেখানে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। ম্যানেজার একটা কাপড়ের ব্যাগে বইগুলো ভরে দিয়েছে। থামেলের রাস্তায় অবশ্য এখনও দু-চারজন লোক দেখা যাচ্ছে। রেস্তরাঁগুলো থেকে ভেসে আসছে জনপ্রিয় ইংরেজি গানের সুর আর হৈ হুল্লোড়ের আওয়াজ। ট্যাক্সি ড্রাইভার ওঁকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তাকেও ট্যাক্সি জমা করে বাড়ি ফিরতে হবে। ট্যাক্সি একটু এগোতেই অল্প অল্প বৃষ্টি শুরু হল। একটু একটু কুয়াশা আর বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার আলোগুলো কীরকম যেন ঝাপসা মায়াময় লাগছে। রাস্তায় বেশি গাড়ি নেই তাই ড্রাইভার বেশ জোরেই চালাচ্ছিল। একটা জায়গায় এসে শর্টকাট করার জন্য ড্রাইভার বড় রাস্তা ছেড়ে এক গলিতে ঢুকল। গলির মধ্যে আলো কম, বৃষ্টি আরও বাড়ছে ... আবছা আলো-আঁধারিতে সব রহস্যময় দেখাচ্ছে।

বিনয়বাবুর বোধহয় একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ মনে হল তিনি গাড়ির মধ্যে নেই ... আশপাশের বাড়ি ঘর কিছুই নেই ... তাঁর চারিদিকে এক নিশ্ছিদ্র কুয়াশা ... দুদিক থেকে দুজন তাঁকে শক্ত করে হাত ধরে নিয়ে চলেছে। পায়ের তলায়ও মাটি নেই ... হাওয়ায় ভেসে চলছেন যেন ... কে এরা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে? পাশে তাকিয়ে তাঁর রক্ত জমে গেল তীব্র আতঙ্কে ... পুঁথিতে আঁকা সেই বিকট মুখ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে গেল তাঁর গলা চিরে। জোরে ব্রেক দিয়ে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিয়ে পিছনে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল "ক্যায়া হুয়া সাব?" সম্বিত ফিরে পেয়ে বিনয়বাবু দেখলেন সব কিছু যেমন ছিল তেমনই আছে। খুব অপ্রস্তুত হয়ে বললেন "কুছ নেই, আপ চালাইয়ে।"

তিনি এর মধ্যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন? আশ্চর্য তো! এরকম তো তাঁর কখনও হয় না। সম্ভবত চারিদিকের আধা অন্ধকার মায়াবী পরিবেশ তাঁর মনের ওপর একটা প্রভাব ফেলেছিল, তাছাড়া সবেমাত্র ঐ পুঁথির ছবিগুলো দেখে সেই স্মৃতিও তাজা ছিল। নিজের মনে ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন বিনয়বাবু, অলৌকিক কিছু তিনি সচরাচর বিশ্বাস করেন না। সাত পাঁচ ভাবতে

ভাবতে হোটেল পৌঁছে গেলেন বিনয়বাবু।

সবাই বিনয়বাবুর জন্য অপেক্ষা করছিল। শুধু সোনুকে আগে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। পরদিন তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। স্বয়ম্ভুনাথ, বুঢ়া নীলকণ্ঠ আর বৌধা দেখতে যাবার প্ল্যান। তারপর এনার্জি থাকলে সন্ধ্যায় একটু কেনাকাটা। খেয়ে সবাই শুয়ে পড়ল। সোনুর জন্য তার ঠাকুরদা, ঠাম্মার ঘরে একটা এক্সট্রা বেড নেওয়া হয়েছে, সে সেখানেই শুতে গেল। বিনয়বাবুর ইচ্ছে ছিল সদ্য কেনা বইগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখার, কিন্তু সুনন্দার ধমকে সে বাসনা আপাতত মুলতুবি রাখাই ঠিক করলেন। ক্লান্ত ছিলেন দুজনেই, শোয়া মাত্র গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন স্বামী-স্ত্রী।

রাত তখন প্রায় দুটো আড়াইটে হবে, সুনন্দার ভয়ার্ত গলার আওয়াজে আর হাতের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল বিনয়বাবুর। চমকে ধড়মড় করে উঠে পড়লেন তিনি ... "কী হয়েছে?"

— "শিগগির আলো জ্বালো আগে" সুনন্দার আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বিছানার পাশেই আলোর সুইচ, হাত বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ আলো জ্বালিয়ে দিলেন বিনয়বাবু। সুনন্দার দিকে তাকিয়ে দেখেন তার মুখ ফ্যাকাশে, থরথর করে কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত

... "কী হল তোমার? দুঃস্বপ্ন দেখেছ?" সুনন্দা ভীতকণ্ঠে বললেন "ঘরের মধ্যে কেউ আছে"।

— "কী বলছ পাগলের মতো? দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, ঘরে কে ঢুকবে?" এ কথা বলেও চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠলেন বিনয়বাবু, বাথরুমে উঁকি দিলেন, খাটের নীচে দেখলেন, দেওয়াল আলমারি খুলে দেখলেন ... তারপর বললেন ... "এবার বুঝতে পারছ তো তুমি স্বপ্ন দেখেছ?" ততক্ষণে সুনন্দা একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছেন, বললেন —

— "না স্বপ্ন নয়, আমার ঘুম ভাঙল কারোর হাতের ছোঁয়ায়, তুমি তো আমার ডানদিকে কিন্তু আমার বাঁ হাতটা কে চেপে ধরল ... বরফের মত ঠান্ডা কনকনে হাত ... মুখের ওপর কেউ যেন নিঃশ্বাস ফেলছিল ... চমকে উঠে চোখ খুলতে দেখলাম দুটো জ্বলজ্বলে চোখ, অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ... জন্তু জানোয়ারের চোখের মতো ... আমি স্পষ্ট দেখেছি ... আর একটা বিশ্রী গন্ধ। "তখন বিনয়বাবুরও মনে হল ঘরের মধ্যে একটা বিজাতীয় গন্ধ

পাচ্ছেন। ভাবনাটা সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দিলেন বিনয়বাবু ... বললেন, "হোটেলের বন্ধ ঘরে বাথরুম থেকে গন্ধ আসছে। বাকিটা তোমার ক্লান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা" সুনন্দা বললেন "আমার পরিষ্কার মনে আছে আমি চোখ খুলেছি ..." বিনয়বাবু বললেন, "হতে পারে জানালার ফাঁক দিয়ে আলো পড়ে কিছু চকচক করছিল, সেটাই তোমার মনে হয়েছে জ্বলজ্বলে চোখ। নাও শুয়ে পড় এবার।"

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর বেশ কিছুক্ষণ ঘুম এল না বিনয়বাবুর। বাড়ি ফেরার সময় তাঁর এরকম বিভ্রম হল, তারপর সুনন্দার দুঃস্বপ্ন ... একি কাকতালীয়? ঘরের গন্ধটা এখনও অল্প অল্প পাচ্ছেন ... সেটা টয়লেটের গন্ধ নয়।

সকাল ছটায় মোবাইলে অ্যালার্ম দেওয়া ছিল, তার আওয়াজে ঘুম ভাঙল দুজনেরই। জানলার পর্দা সরিয়ে দুজনেরই মন ভালো হয়ে গেল। বাইরের আকাশে মেঘের চিহ্নবাষ্প নেই, ঝকঝকে নীল আকাশ ... এমনকি দিগন্তে পাহাড়গুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তৈরি হয়ে প্রাতঃরাশের জন্য নীচে নামার ঠিক আগে বইয়ের দোকানের ম্যানেজারের ফোন এল। উনি বললেন — "স্যার, যদি কিছু মনে না করেন একটা অনুরোধ করব? আপনি যদি দুদিনের জন্য পুঁথিটা আমাকে ধার দেন তাহলে আমি আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে দেখাতে পারি। আর আপনার আপত্তি না থাকলে আমি পৃষ্ঠাগুলো ফোটোকপি করে রাখতে চাই। কালকে ঐ ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে পুঁথিটা সাধারণ নয়। আর একটু অনুসন্ধান করা উচিত। আপনারা তো দু-তিনদিন এখানে আছেন। তার মধ্যেই আমি ফেরত দিয়ে দেব।" বিনয়বাবু এর মধ্যে আপত্তি করার কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না। ম্যানেজার লোকটি বেশ সজ্জন, ওঁকে বিশ্বাস করাই যায়। রাজি হয়ে গেলেন তিনি। খুব খুশি হয়ে ম্যানেজার বললেন, "আমি আমার ছেলেকে পাঠাচ্ছি এখুনি, পনেরো-বিশ মিনিটে পৌঁছে যাবে মোটরবাইকে।"

বিনয়বাবুরা প্রাতঃরাশ শেষ করে নীচে রিসেপশনে পৌঁছতেই একটি সুদর্শন যুবক এগিয়ে এল। দোকানের কার্ড দিয়ে সে নিজের পরিচয় দিল। ম্যানেজার আগেই বলে দিয়েছিলেন তাঁর ছেলের নাম মনীশ। কাপড়ের ব্যাগে মোড়া পুঁথিটা নিয়ে সে নমস্কার জানিয়ে বাইকে স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

বিনয়বাবুদের কাঠমান্ডু ঘোরা বেশ নির্বিঘ্নেই কাটল দুদিন ধরে। প্রথম দিনে সব প্ল্যান অনুযায়ী জায়গা দেখাও হল, সন্ধ্যার সময় একটু কেনাকাটাও হল। দ্বিতীয় দিন পশুপতিনাথ দর্শন হল, তারপর নারায়ণহিতি প্রাসাদ, যা আগে নেপালের রাজাদের বাসস্থান ছিল, তা দেখা হল। বিকালের দিকে সবাই গেলেন পাটান দেখতে। অপূর্ব সুন্দর কাঠের কারুকার্য করা সব মন্দির আর প্রাসাদ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন সবাই। ওঁদের হোটেল থেকেই একটা বড় গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ড্রাইভার রাজু অত্যন্ত ভদ্র, হাসিখুশি এবং সব দর্শনীয় জায়গা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। পরের দিনের গন্তব্য নাগরকোট, কাঠমান্ডু থেকে এক ঘণ্টার দূরত্ব। মাঝরাস্তায় পড়বে ভক্তপুর, এক প্রাচীন রাজধানী। সেখানকার মন্দির ও প্রাসাদগুলিও অপূর্ব সুন্দর।

নাগরকোট রওয়ানা হবার আগে বইয়ের দোকানের ম্যানেজারের ফোন এল আবার। ফোনে ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ খুব চিন্তিত শোনাল। উনি বললেন দুজনকে উনি পুঁথিটা দেখিয়েছেন। প্রথমজন জানিয়েছেন, পুঁথিতে প্রাচীন তিব্বতি ছাড়া আর যে ভাষায় লেখা, সেটি মধ্যপ্রাচ্যে দুই সহস্রাব্দ আগে যেসব ভাষা প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে মিল আছে। কিন্তু তিনি তার পাঠোদ্ধার করতে পারেননি একবর্ণ। অন্য জন পুঁথিটা দেখেই চমকে ওঠেন। জিজ্ঞাসা করেন। কোথায় পেলেন এই পুঁথি? এই দ্বিতীয় জন মন্ত্র তন্ত্র নিয়ে চর্চা করেন, অনেকের ধারণা ওঁর কিছু অলৌকিক শক্তি আছে। তিনি ওটি কিনে নিতে চান। ওঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এ জিনিস যার তার কাছে থাকা উচিত নয়। উনি এর মর্ম বোঝেন, তাই ওঁর কাছেই ঠিক থাকবে। ম্যানেজার তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করেছেন। এদিকে তাঁর দোকানে একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। রাত্রে একজন বিশ্বস্ত দারোয়ান তাঁর বইয়ের দোকান ও পাশের দুটো দোকান পাহারা দেয়। সে কাল রাতে দোকানের ভেতরে অদ্ভুত সব আওয়াজ শুনেছে। অথচ সামনের আর পিছনের দুটো দরজায় তালা বন্ধ। তার কথা অনুযায়ী, মানুষের গলার স্বর নয়, কোন জান্তব গর্জন শুনেছে সে দোকানের ভেতরে। ম্যানেজার তাঁকে অনুরোধ করলেন আর দুদিন সময় দেওয়ার জন্য। একজন খুব পণ্ডিত মানুষের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে ফোনে। কিন্তু উনি এখন বিরাটনগরে আছেন। কাল ফিরবেন। বিনয়বাবু বললেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কাল পরশু দুদিন তো ওঁরা পোখারায় থাকবেন। তার পরদিন

ফিরে কাঠমান্ডুতেই থাকবেন। পুঁথিটা তখন ফেরত দিলেই হবে। বিনয়বাবু জানতেন না ম্যানেজারের সাথে এই তাঁর শেষ কথোপকথন।

পোখারা ভ্রমণ খুব ভালোভাবেই হল বিনয়বাবুদের। যেদিন পৌঁছেছিলেন সেদিন আকাশ মেঘলা ছিল। কাঠমান্ডু'র অন্তর্দেশীয় বিমানবন্দর থেকে মিনিবাসের আকারের প্লেন যখন আকাশে উড়ল তখন সবার বেশ ভয় ভয় লাগছিল। শুধু সোনুর খুব মজা লেগেছে। আঠারো সিটের প্লেনে ককপিটের দরজা নেই, যাত্রীরা ভিতরের যন্ত্রপাতি পাইলটদের সবই দেখতে পাচ্ছে। বুদ্ধা এয়ারের ছোট্ট প্লেনটা অনেকগুলো পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে উড়ে গিয়ে একসময় টুক করে পোখারা পৌঁছে গেল। নেমে সবার মন খারাপ হয়ে গেল ... মেঘের জন্য মচ্ছ পুছরে শৃঙ্গ দেখাই যাচ্ছে না। এখানে তাঁরা যে হোটেলে আগে থেকে বুকিং করেছিলেন তাদের টয়োটা মিনিভ্যান অপেক্ষা করছিল। হোটেলে এসে আবার মনটা ভালো হয়ে গেল সবার। তিনটে ঘরের সঙ্গেই বেশ বড় ব্যালকনি, যেখান থেকে লেক দেখা যায়। লেকের মাঝখানে একটা দ্বীপ, সেখানে গাছপালার মধ্যে থেকে একটা মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। মালপত্র রেখে চা খেয়ে প্রথম গন্তব্য ওখানেই। পরদিন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, মচ্ছ পুছরে দেখা দিল সগৌরবে, বাকি সব দর্শনীয় স্থান সুন্দরভাবে ঘোরা হল। সবাই খুব খুশি। বিনয়বাবু জানতেন না পরদিন কাঠমান্ডুতে কী বিভীষিকাময় দুঃসংবাদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

পরদিন সকালের ফ্লাইট ধরে ওঁরা কাঠমান্ডু পৌঁছে গেলেন দশটা নাগাদ। আগের হোটেলেই বুকিং ছিল, তাদেরই গাড়ি এসে নিয়ে গেল। যখন চেক ইন করছেন তখন হোটেলের ম্যানেজার এসে বিনয়বাবুকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন সকাল থেকে থামেল'এর এক বইয়ের দোকান থেকে বিনয়বাবুর খোঁজ করে অন্তত সাত আট বার ফোন এসেছে। একটা ফোন পুলিশ থানা থেকেও এসেছে। কিছু একটা বড় রকমের বিপদ হয়েছে সেখানে। কথার মাঝেই রিসেপশনে বিনয়বাবুর জন্য আবার ফোন এল, অপারেটর একটা কর্ডলেস ফোন ওঁর হাতে দিয়ে গেল। ফোন করেছে মনীশ, দোকানের ম্যানেজারের ছেলে, তার গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা, — "বিনয়জি বলছেন? আমি মনীশ, আপনার কাছ থেকে পুঁথিটা নিতে এসেছিলাম ..."

— "হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। কী ব্যাপার, কী হয়েছে?"

— "বিনয়জি, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে, বাবাকে কেউ খুন করেছে।" বিনয়বাবু ভীষণ রকম চমকে গেলেন। শান্তিপ্রিয় মানুষ, তিনি যে জগতের বাসিন্দা সেখানে খুন জখমের খবর সচরাচর পৌঁছয় না। বললেন — "কী বলছেন? খুন হয়েছেন? কখন?" মনীশ কান্না জড়ানো গলায় বলল "কাল রাতে, আপনি একটু ইন্সপেক্টর প্রধানের সঙ্গে কথা বলুন!" ও দিক থেকে একটা অপরিচিত গলা শোনা গেল "নমস্তে, আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রধান বলছি। আপনাকে অনুরোধ করছি যদি আপনি একবার এই বইয়ের দোকানে আসতে পারেন আমাদের তদন্তের খুব সুবিধা হয়। আমি জানি আপনারা কাল কলকাত্তা ফিরে যাবেন। আমি কথা দিচ্ছি বেশি সময় লাগবে না।"

বইয়ের দোকানে পৌঁছে যা শুনলেন তার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলেন না বিনয়বাবু একেবারেই। দোকানের সামনে অনেক কৌতূহলী লোকের ভীড়, চারজন পুলিশ কনস্টেবল কারোকে এগোতে দিচ্ছে না। গেটের সামনে মনীশ দাঁড়িয়ে ছিল, তার চোখ লাল, চেহারা বিপর্যস্ত। সে ইশারা করতে সিপাহীরা বিনয়বাবুকে ঢুকতে দিল। ভিতরে দুজন পুলিশ অফিসার, আরও তিনজন অপরিচিত মানুষ, তাঁদের একজন বৌদ্ধ লামাদের মতো পোশাক পরা। ম্যানেজারের অফিসের মধ্যে টেবিলের ওপর সাদা কাপড়ে মোড়া তাঁর মরদেহ। পিছনে ক্যাফেটারিয়ায় গিয়ে ওঁরা বসলেন। ইন্সপেক্টর প্রধানের মুখে জানা গেল, কাল রাত্রে আটটার সময়ে দোকান বন্ধ করে ভিতরে কাজ করছিলেন ম্যানেজার। রোজই এরকম হিসেবে পত্র মিলিয়ে উনি সাড়ে নটা, দশটা নাগাদ বাড়ি ফেরেন বাইরের দরজায় তালা লাগিয়ে। গতকাল রাত সাড়ে নটার সময় দোকানের ভিতর থেকে তাঁর আর্তনাদ শুনতে পায় দারোয়ান। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় সে ঢুকতে পারেনি ... অনেকবার ধাক্কা দিয়েছে, ডেকেছে ... কিন্তু কোন উত্তর পায়নি। তার কাছে বাড়ির ফোন নম্বর না থাকায় সে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। ম্যানেজারের অফিসের মধ্যে তারা দেখে এক বিভৎস দৃশ্য ... ম্যানেজারের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে, তাঁর মাথাটা সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ঘোরানো, ঘাড় ভেঙে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মুখে এক

অবর্ণনীয় আতঙ্কের চিহ্ন।

অন্য তিনজন লোকের একজন ম্যানেজারের বন্ধু ও ব্যবসার অংশীদার। জানা গেল ম্যানেজার ঐ দোকানের আংশিক মালিক ছিলেন। ব্যবসা উনিই চালাতেন, কারণ বইয়ের ব্যবসায় তাঁর বহুদিনের অভিজ্ঞতা। বন্ধুর কাছে বড় অংশের মালিকানা থাকলেও উনি ব্যবসার ব্যাপারে নাক গলাতেন না। তাঁর অন্য ব্যবসা আছে। দুজনের বন্ধুত্ব ছোটবেলা থেকে। অন্য আর এক ভদ্রলোক সেই জন যিনি পুঁথিটা কিনতে চেয়েছিলেন। তিনিও ম্যানেজারের পরিবারের পূর্বপরিচিত। লামার পোষাক পরা বয়স্ক সৌম্যদর্শন মানুষটি তাঁর গুরু। তিনি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন পুঁথিটার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য।

ইন্সপেক্টর প্রধানের মতে, অনেক উপর থেকে পড়ে গিয়ে এরকমভাবে ঘাড় ভেঙে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু অফিসের ফলস সিলিং মাত্র সাত ফুট উপরে, ওপর থেকে পড়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। পড়ে গেলে শরীরে অন্য জায়গায় আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা ... কিন্তু ওপর ওপর দেখে সেরকম কিছু চোখে পড়েনি। কিন্তু মুখের পাশে দুদিকে, কানের সামনে তিনটে করে গভীর ক্ষত ... কোন তিন ফলাওয়ালা ধারালো অস্ত্র বা নখ দিয়ে করা। কিন্তু সবচেয়ে বড় রহস্য দোকানের সব দরজা জানালা বন্ধ ছিল, বাইরে থেকে কারো বা কিছুর ভিতরে ঢোকার কোনও চিহ্ন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ওঁরা পাননি। এবার সৌম্যদর্শন লামা মুখ খুললেন। বললেন "সেই পুঁথিটা কি আমি একবার দেখতে পারি?" মনীশ উঠে গিয়ে একটা স্টিলের আলমারি চাবি দিয়ে খুলে সিল্কের কাপড়ে মোড়া পুঁথিটা নিয়ে এল। সবারই আগ্রহ পুঁথিটা দেখার। পুঁথির পাতাগুলো উল্টে পাল্টে ভালো করে দেখলেন লামা। মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের মুখ একটু ভাবলেশহীন হয়ই, তাছাড়া ইনি তো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ... কিন্তু লামা যখন মুখ তুললেন তাঁর কপালে চিন্তার কুঞ্চণ কারোর চোখ এড়াল না। উনি প্রশ্ন করলেন "এই পুঁথিটা কোথা থেকে এসেছে জানেন কেউ"?

বিনয়বাবু যা জানতেন বললেন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গেই ম্যানেজারের কথা হয়েছিল। লামা বললেন "এটি কোন বৌদ্ধ পুঁথি নয়"। বিনয়বাবু খুব

অবাক হয়ে বললেন "বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নয়?"

— না। আমি এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই যদিও, কিন্তু আমি নিশ্চিত এ পুঁথিটা কোন পবিত্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নয়। সম্ভবত এটা বন ধর্মের পুঁথি। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হওয়ার আগে বন ধর্মই ছিল সেখানকার মানুষদের ধর্ম। সেই ধর্মে দেবতার সঙ্গে অনেক অপদেবতা, অশুভ শক্তিরও কথা বলা হত। যারা এর চর্চা করত তারা কেউ কেউ সেই সব অপদেবতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখত, যাদের শক্তি ভয়ংকর। সেই সব অপদেবতাকে দিয়ে তারা মানুষের ক্ষতি করত নিজেদের শক্তি জাহির করার জন্য। সবাই হয়তো এরকম ছিল না, কিন্তু অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার লোভে কিছু লোক বিপথে যেত। শুভশক্তির বদলে অশুভ অপদেবতাকে ডেকে এনে তারা নিজেদের কাজে লাগাত। যদিও এ কাজ অতীব বিপজ্জনক। অনেকের প্রাণ যেত এর চর্চা করতে গিয়ে।"—"এখনও আছে এই ধর্মের চর্চা"? প্রশ্ন করলেন বিনয়বাবু। —"আছে, তবে অনেক পরিবর্তন হয়েছে আগের থেকে। বৌদ্ধ ধর্মেরও তন্ত্রের প্রভাব পড়েছে তার ওপর। অল্প কিছু বন মনাস্টারি তিব্বতে, নেপালে ও উত্তর ভারতে এখনও আছে। এখনকার বন ধর্মকে বলা হয় ইয়ুংড্রুং বন। আগের বন ধর্মকে বলা হয় ব্ল্যাক বন। এর কিছু বিপথগামী অনুসারী শুভশক্তির আরাধনা না করে অপদেবতা, ভূত প্রেত আবাহন করার বিদ্যা চর্চা করত। এখন অবশ্য সেরকম লোক বেশি দেখা যায় না। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গোপনে এসবের চর্চা থাকতেও পারে। এমনিতে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর প্রাচীন বন ধর্মের চর্চা প্রায় বন্ধই হয়ে যায় তিব্বতে এবং চিনে। এই পুঁথিতে শুধুমাত্র অশুভ শক্তিকে আবাহন করার উপায় লেখা আছে সম্ভবত প্রাচীন তিব্বতি হরফে যা কিছুটা আমি বুঝতে পারছি। কিছু অপদেবতার ছবিও আছে। অন্য কোন অপরিচিত ভাষাতেও কিছু লেখা আছে যা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু এর মধ্যে বন ধর্মের ভালো দিকটা নেই। এটি একটি ভয়ংকর এবং অশুভ পুঁথি।"

মনীশ জিজ্ঞাসা করল "তাহলে কি এই পুঁথিটাই আমার বাবার মৃত্যুর কারণ?" লামা বললেন "যেটা আমার খটকা লাগছে, সেটা হল পুঁথিটার কারো অনিষ্ট করার ক্ষমতা নেই। এতে লেখা ক্রিয়াগুলি কেউ যদি সঠিক নিয়মে পালন করে তবেই সেই অশুভ শক্তিদের আবির্ভাব ঘটবে এবং যে

তাদের আবাহন করবে সে ঐ অপদেবতাদের দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিতে পারবে। কেউ নিশ্চয়ই এই পুঁথিটা নিয়ে লেখা অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সঠিকভাবে না পারার কারণে কোন ভয়ংকর অপদেবতার আগমন ঘটেছে যাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। যে আবাহন করেছে, সে হয় মারা পড়েছে নয় পালিয়ে গেছে। অবশ্য পালানো অসম্ভব, কারণ এই অপদেবতাদের অগম্য স্থান নেই। শুধুমাত্র মহা পবিত্র তীর্থস্থানে তারা ঢুকতে পারবে না। আমার দৃঢ় ধারণা মনীশের বাবার মৃত্যু এইরকম কোন অপদেবতার হাতে হয়েছে।"

বিনয়বাবু ইন্সপেক্টর প্রধানকে আগেই বলেছিলেন কী করে পুঁথিটা এই দোকানে এসেছে। তিনি লামাকেও বললেন, সেই অজানা বিদেশির কথা যে মাত্র তিন হাজার নেপালি মুদ্রায় বিক্রি করে গেছে এই পুঁথি। তিনি যে কিনেছেন পুঁথিটা সে কথা সবারই জানা। লামা সব শুনে বললেন "আমি আপনাকে একটা উপদেশ দিতে চাই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে। এই পুঁথি আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন না, বিপদ হতে পারে। মনীশ পরে আপনাকে ক্যুরিয়ার দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে আমি আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী চেষ্টা করব যদি পুঁথির দোষ কাটিয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ যে অপদেবতা এসেছে তাকে যদি তার নিজের জগতে ফেরত পাঠানো যায়।"

দুজন পুলিশ অফিসার এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন লামার কথা। মনে হল ওঁরা লামাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। ইন্সপেক্টর প্রধান এবার মুখ খুললেন "দেখুন, আপনি হয়তো ভাবছেন পুলিশের লোক কী করে এসব ভূত-প্রেত অপদেবতা বিশ্বাস করে। অবশ্যই আমরা রিপোর্টে লিখতে পারব না মনীশের বাবার হত্যাকারী কোন প্রেতলোকের অধিবাসী। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা দু-একটা আমরা আগেও দেখেছি যার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। আপনার মঙ্গলের জন্য পুঁথিটা সঙ্গে না নিয়ে যাওয়াই ঠিক। আমার তো মনে হয় পুঁথিটা যদি আপনি একেবারেই না নিয়ে যান আরও ভালো। মনীশ আপনার টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। আমি তো বলব পুঁথিটা পুড়িয়ে ফেলাই সবচেয়ে ভালো হবে।"

লামা আপত্তি করলেন। বললেন "ঐ পুঁথির মধ্যেই আছে দুষ্ট অপদেবতাকে শান্ত করে তার জগতে ফিরিয়ে দেবার উপায়। যতক্ষণ না

সেই উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ পুঁথি নষ্ট করা চলবে না। তাছাড়া উনি কি রাজি হবেন এমন একটি দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ নষ্ট করে দিতে? যদিও সেটাই হয়তো ওনার জন্য ভালো হবে।"

বিনয়বাবু পুঁথিটা রেখে যেতে রাজি হলেন। মনীশকে বললেন "তোমার বাবা আমাকে বলেছিলেন পুঁথিটার দু-একটা ফোটোকপি করবেন। তুমি কি জানো কিছু? হয়ে থাকলে আমাকে একটা কপি দাও।" মনীশ বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে গিয়ে একটা ফাইল নিয়ে এল। তার মধ্যে পুরো পুঁথিটার ফটোকপি, রঙিন। ওপরের কাঠের পাটি দুটোরও নকল করেছেন। মৃত মানুষটির ওপর শ্রদ্ধা হল বিনয়বাবুর। টেলিফোন নম্বর, ঠিকানা ইত্যাদি বিনিময়ের পর উঠলেন বিনয়বাবু। হঠাৎ তাঁর কাঠমান্ডুতে প্রথম রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল যখন পুঁথিটা তার কাছে ছিল। লামাকে তিনি তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এবং সুনন্দার ভয়ংকর স্বপ্নের কথা বললেন। আবার লামার কপালে চিন্তার কুঞ্চন দেখা গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার মনে হয়েছে দুদিক থেকে দুজন আপনার হাত ধরে ছিল?" বিনয়বাবু হ্যাঁ বলতে লামা নিজের মনেই যেন বললেন "তবে কি একাধিক অশুভ শক্তি এসেছে? চিন্তার বিষয়" বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন আপনারা সব পুণ্যস্থান দর্শন করেছেন, আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই প্রসাদও আছে, সেজন্য প্রথম দিনের পর আর আপনাদের কাছে আসেনি। সবাই আপনারা পূজার ফুল বা প্রসাদ সঙ্গে রাখবেন।" একটা লাল কালির কলম নিয়ে ফাইলটার ওপর স্বস্তিকা এঁকে দিলেন লামা। বললেন বন ধর্মেরও শুভ চিহ্ন স্বস্তিকা। বিনয়বাবু বিদায় নেবার সময় লামা দু-হাত তুলে বললেন "তথাগত আপনাদের রক্ষা করবেন"।

বিনয়বাবুদের সেদিন তাড়াহুড়ো কিছু ছিল না। যা যা দেখার সব মোটামুটি হয়ে গেছে। বিকালে একটু কেনাকাটার জন্য বেরোন হবে। পরদিন সকালে ফ্লাইট, তাই ভোরবেলা পৌঁছতে হবে এয়ারপোর্ট। থামেল থেকে ফিরে এসে বিনয়বাবু রিসেপশনে একটা নেপাল ট্যুরিজমের কাগজ দেখছিলেন আর কোন দর্শনীয় স্থান বাকি রয়ে গেল কিনা দেখার জন্য। সকালের ঘটনা তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে, দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। বাড়ির কারোকে কিছু বলেননি তিনি এই পুঁথির সম্পর্কে, এমনকি সুনন্দাকেও নয়। শুধু শুধু সবাই মিলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে লাভ কি?

সব দর্শনীয় জায়গার নাম দেখতে দেখতে তাঁর এক জায়গায় চোখ আটকে গেল, এখানে তো যাওয়া হয়নি। তাঁদের গাড়ির ড্রাইভার কাম গাইডও তো কিছু বলেনি। কাঠমান্ডু শহর থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে যে সুন্দর এক দক্ষিণাকালি মন্দির আছে তা তো জানতেন না। সবাইকে বলতেই যাবার জন্য রাজি হয়ে গেল। বিনয়বাবু রিসেপশনে বলে দিলেন গাড়ির জন্য। দুপুরের খাওয়ার পরই রওয়ানা হওয়া যাবে।

মন্দির পৌঁছতে এক ঘণ্টাও লাগল না ওঁদের। খুব একটা ভিড় ছিল না দর্শনার্থীদের। জানা গেল শনি মঙ্গলবার বেশ ভিড় হয়, বলিও হয়। ভালোভাবে পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে ওঁরা যখন মন্দির থেকে বার হবেন তখন মন্দিরের ভিতরে এক আধা অন্ধকার কোণ থেকে একজন ওঁদের থামতে বললেন। ওঁরা ঘুরে দেখেন দীর্ঘদেহী জটাধারী এক সন্ন্যাসী, পরনে রক্তবস্ত্র, মুখ সাদা দাড়িতে প্রায় ঢাকা ... হাত তুলে ওদের থামতে বললেন। তাঁর হাতে ছোট একটা বেতের ডালা ভর্তি জবাফুল। তিনি প্রত্যেকের হাতে একটি করে ফুল দিয়ে হিন্দিতে বললেন "যত্ন করে রেখে দেবে। শুকিয়ে গেলেও ফেলবে না। সব বিপদ থেকে মা রক্ষা করবেন তোমাদের।"

বিনয়বাবু ভাবলেন সব মন্দিরেই এরকম কিছু চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়, দক্ষিণার লোভে এসব ভড়ং করে। তাই তিনি পকেটে হাত ঢোকালেন ... দশ, বিশ টাকা অন্তত দিতে হবে। সন্ন্যাসী হঠাৎ তাঁর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন, অদ্ভুত অন্তর্ভেদি দৃষ্টি তাঁর। বিনয়বাবুর মনে হল তাঁর মনের কথা স্বচ্ছন্দে পড়ে নিচ্ছেন সন্ন্যাসী। বিনয়বাবুকে অপেক্ষা করতে বলে সন্ন্যাসী অন্য সবাইকে হাত নেড়ে চলে যেতে বললেন। সবাই যাবার পর তিনি বিনয়বাবুকে হিন্দিতে যা বললেন তার মর্মার্থ 'বিনয়বাবু অজান্তে ভীষণ বিপদ ডেকে এনেছেন শুধু তাঁর নিজেরই নয়, তাঁর সারা পরিবারের। তার জন্য অবশ্য তিনি দায়ী নন। কিন্তু পুঁথির মালিকানা তাঁর বলে বিপদ তাঁরই বেশি। মায়ের পায়ে ছোঁয়ানো ফুল যেন কখনো হাতছাড়া না করেন। আর একটা কথা ... তিনি তো পুঁথির পাঠোদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করবেন ... যিনি পড়বেন তিনি যেন পুঁথির ভাষা সশব্দে কখনোই না পড়েন। তাহলে মহা বিপদ হবে। নিজের ভাষায় অর্থ বলতে পারেন কিন্তু ঐ প্রাচীন ভাষার শব্দ যেন মুখে উচ্চারণ না করেন'। এই বলে সন্ন্যাসী প্রায় মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে

হাত নেড়ে বললেন, 'অব তু যা'। বিনয়বাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সকাল থেকে একটার পর একটা অনৈসর্গিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে তাঁর পরিচিত বিশ্ব সম্বন্ধে ধ্যানধারণাটাই টলে গিয়েছে। কে এই সন্ন্যাসী? ইনি কি সর্বজ্ঞ? কী করে উনি সব জানলেন? আর উনি এঁকে সাধারণ অর্থলোভী ভন্ড ভেবেছিলেন? বিনয়বাবু ভাবলেন ক্ষমা চাইবেন সন্ন্যাসীর কাছে। কিন্তু উনি কোথায় যে চলে গেলেন ... অনেক খুজেঁও আর দেখা পেলেন না।

ফেরার সময় সবাই প্রশ্ন করতে লাগল সন্ন্যাসী ওঁকে আলাদা করে কী বললেন জানার জন্য। বিনয়বাবু হুঁ হাঁ করে কাটিয়ে গেলেন। চিন্তায় ডুবে রইলেন সারা রাস্তা। তাঁর জীবনে কখনও কোন অলৌকিক ঘটনার অভিজ্ঞতা এর আগে হয়নি। এ বিষয়ে অনেক গল্প শুনে থাকলেও কখনোই পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি। সবসময়ই মনে হত এ সব কাহিনী অতিকথনদুষ্ট। কিন্তু এখন তাঁর যা অভিজ্ঞতা হচ্ছে তাকে অবিশ্বাস করেন কী করে?

পরদিন ভোরবেলা ইমিগ্রেশন, সিকিউরিটি পার করে ওঁরা ত্রিভুবন এয়ারপোর্টের ভিতরে লাউঞ্জে বসলেন। সেখানে সবসময়ই স্থানাভাব। কোন রকমে সবার বসার জায়গা করে দিয়ে দেখতে গেলেন কলকাতার ফ্লাইটের আর কত দেরি। তখনও ঘণ্টা খানেক দেরি দেখে সোনুর জন্য কিছু খাবার কিনতে একটিমাত্র স্টলের সামনে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর মোবাইলের রিং বেজে উঠল। ফোন করেছেন ইন্সপেক্টর প্রধান, একটা খবর দেওয়ার জন্য। বললেন, "আমি সংক্ষেপে বলছি, কাল সন্ধ্যার সময় পশুপতিনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে এক বিদেশি মানুষকে পাওয়া গেছে, জ্বরে প্রায় অচৈতন্য, সম্ভবত অভুক্ত ছিল দু-তিন দিন। ঐ এলাকা তাঁর দায়িত্বে বলে কনস্টেবলরা বিদেশি লোকটাকে হাসপাতালে ভর্তি করে তাঁকে খবর দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাঁদের জানতে হয় লোকটি কোন দেশের, তারপর সেই দেশের দূতাবাসে খবর দিতে হয়। সেই খোঁজ করতে গিয়ে এর ব্যাকপ্যাকে হাতড়ে বইয়ের দোকানের ম্যানেজারের কার্ড পাওয়া গেছে। লোকটা আমেরিকান। অর্ধচৈতন অবস্থায় বার বার সে বলছিল "Please save me, save me from the demons"। আমার মনে হয় এই লোকই পুঁথিটা বিক্রি করেছিল। আমেরিকান দূতাবাস ওকে সরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে ভালো প্রাইভেট নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়েছে। তবে আমি ওদের বলেছি ও একটু সুস্থ হলেই আমি ওকে

জিজ্ঞাসাবাদ করব। খুনের মামলা শুনে ওরা আপত্তি করেনি। কিছু জানতে পারলে আমি আপনাকে ই-মেল করব। বুঝতেই তো পারছেন আই এস ডি কল করা খরচসাপেক্ষ ব্যাপার।" বিনয়বাবু ওঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন "আপনাকে কল করতে হবে না। আপনি মেল করলে আপনার ল্যান্ডফোনে আমি কল করব।" ইন্সপেক্টর প্রধান বললেন "আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।"

আকাশে মেঘ ছিল বলে দু-একবার ঝাঁকুনি বাদ দিলে কাঠমান্ডু থেকে কলকাতা যাত্রা নির্বিঘ্নেই কাটল। নিজের দেশে ফিরে কিছুটা নিশ্চিন্ত লাগছিল বিনয়বাবুর। বাড়ির গাড়ি নিয়ে পুরনো ড্রাইভার অপেক্ষা করছিল। বিনয়বাবুর মা বাবা সোজা চুঁচুড়া ফিরে গেলেন। বিনয়বাবু কলকাতার ফ্ল্যাটে সুনন্দা আর সোনুর সঙ্গে দুদিন কাটিয়ে ফিরে যাবেন নিজের পরিচিত পড়াশোনার জগতে। সুনন্দার বাবা মা চলে গেলেন তাঁদের বাড়িতে। এই দুদিনে তাঁকে দুজন পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা করতে হবে। একজন তাঁর বাবার স্কুলের বন্ধু ছিলেন, পরে অবশ্য পড়াশোনার বিষয় আলাদা হয়ে যায়। বহু বছর ইংল্যান্ডের এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপনা করে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। প্রাচীন ভাষা, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব নিয়ে তাঁর অগাধ পড়াশোনা। বিনয়বাবুর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া সম্পূর্ণ অন্য দিকে হওয়া সত্ত্বেও পুস্তক প্রেমের সুবাদে দুই অসমবয়সীর ঘনিষ্ঠতা। বিনয়বাবুকে অত্যন্ত স্নেহ করেন প্রফেসর দাশগুপ্ত।

দ্বিতীয়জন তাঁর সমবয়সী। খামখেয়ালি এক বোহেমিয়ান চরিত্র। কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী এক ধার্মিক পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্য। বাড়িতে পূজা অর্চনার বংশানুক্রমে প্রচলন থাকা সত্ত্বেও কী করে সে বাড়ির ছেলে ঘোরতর নাস্তিক হয়ে গিয়েছিল সে এক রহস্য। কিন্তু সে অনেক আগের কথা। এখন কালিকিঙ্করের কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। বিনয়বাবুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব কলেজ থেকে। কালীকিঙ্কর ওরফে কালী থার্ড ইয়ারে মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে। কিন্তু বিনয়বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক অটুট থেকে গেছে। তবে যোগাযোগ হয় কালেভদ্রে। মাঝে মাঝে ফোন করে, কখনও কামাখ্যা থেকে, কখনও তারাপীঠ থেকে আবার কখনও কন্যাকুমারী থেকে। বেশিরভাগ সময়ই তার ঠিকানা কোন না কোন পীঠস্থান। রোজগারের বিশেষ কোন সংস্থান নেই, কিন্তু সেটা তার তীর্থ থেকে তীর্থে ঘুরে বেড়ানোর বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি

কখনও। জিজ্ঞাসা করলে বলে ... "ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দির ... একা মানুষের আবার সমস্যা" কালী বিয়ে করেনি। এখন তার আগ্রহ একমুখী ... তার মতে তন্ত্রের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সব জ্ঞানের রহস্য ... সেই জ্ঞানের খোঁজেই সে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়। বিনয়বাবুকে খুঁজে দেখতে হবে কালী এখন কলকাতায় আছে কি না।

পরদিন সকালে বিনয়বাবু একটা ই-মেল পেলেন। প্রেরক ইন্সপেক্টর প্রধান। বক্তব্য সংক্ষেপে এই "বিদেশি লোকটা এখন অনেকটা ভালো আছেন এবং পুলিশের কাছে বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে অনেক কিছু জানা গেছে।" বিনয়বাবু তৎক্ষণাৎ ফোন করলেন ইন্সপেক্টর প্রধানকে। দুবার চেষ্টার পর লাইন পাওয়া গেল। ওদিকে ইন্সপেক্টরের গলার আওয়াজ বেশ খুশি খুশি শোনাল ... "এই আমেরিকান লোকটার নাম উইলিয়াম ভ্যান্ডারবিল্ট। বিখ্যাত ধনকুবের ব্যবসায়ী ভ্যান্ডারবিল্ট পরিবারের সঙ্গে লতায় পাতায় কিছু একটা সম্পর্ক আছে। এর বাবা মাও যথেষ্ট ধনী, কিন্তু ছেলে একটু পাগলাটে, ছন্নছাড়া ... বাবা মা'র সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখে না। আমেরিকান দূতাবাস তার বাবাকে খবর দিয়েছে। ছেলে অসুস্থ, কপর্দকশূন্য অবস্থায় দূর দেশে হাসপাতালে পড়ে আছে শুনে তারা খুব চিন্তিত। দূতাবাসকে চাপ দিচ্ছে উইলিয়াম একটু সুস্থ হলেই যেন তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উইলিয়াম এখন আগের তুলনায় অনেকটা সুস্থ এবং গতকাল সন্ধ্যায় সে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছে। তার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে লম্বা বিমানসফর করার মতো অবস্থায় আসতে আরও দুতিন দিন লাগবে। গত সন্ধ্যায় প্রথমে সে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু যখন শুনল যে বইয়ের দোকানের ম্যানেজার রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছেন তখন সে অত্যন্ত বিচলিত ও ভীত হয়ে পড়ে। তারপর সে তার সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলে। খুব কম বয়স থেকেই তার আগ্রহ পরলোকতত্ত্ব ও আধিভৌতিক বিষয়ের ওপর। স্কুলে থাকতেই সে আর কয়েকজন সঙ্গী মিলে প্লানচেট করত। স্কুলের গন্ডি পেরোনোর আগেই সে নানা ধরনের নেশা করতে শেখে এবং একসঙ্গেই বাড়ি ও লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। বাবা মা ও তার দিদি অত্যন্ত দুঃখ পায় সে জন্য। তার আগ্রহ এরপর চলে যায় উইচক্রাফ্‌ট বা ডাকিনীবিদ্যার চর্চার দিকে। ইদানীং আমেরিকার বহুলোক এই ধরনের চর্চা করে থাকে, তাদের সংগঠন, আচার অভীচার সব

গুপ্ত জায়গায় হয়। সে এরকম একটা চক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এই আশায় যে প্রেততত্ত্ব, পরলোক সম্বন্ধে তার জ্ঞান বাড়বে। তার ধারণা ছিল এর চর্চা করলে তার অনেক অলৌকিক শক্তি হবে, যার সাহায্যে সে অন্য লোকের মনের কথা জানতে পারবে, অন্য মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় এদের আসরগুলোতে একটা নকল রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, আধা অন্ধকার হলঘরে প্রচুর ধূপধুনো জ্বালিয়ে ধোঁয়া করে একদল নরনারী সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে কোন প্রাচীন দেবতা বা অপদেবতাকে আবাহন করে, তারপর একজনের ভর হয় ... সবাই সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠে 'তিনি এসেছেন' ... কিন্তু তার মনে হয় সবটাই ভড়ং। অনেক এইরকম দলে সে গেছে গুপ্তবিদ্যার খোঁজে, অলৌকিক শক্তির খোঁজে। কিন্তু সব জায়গাতেই সে হতাশ হয়। কোথাও নেশা করে সবাই দাবি করে তাদের তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে, কোথাও 'এশিয়ান তন্ত্রা'র নামে যথেচ্ছ যৌনাচার চলে ... আর কোথাও শুধুই লোক ঠকানো। এই সময় হতাশ হয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে। তাকে ড্রাগস ছাড়ানোর জন্য এক ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার ড্রাগের নেশাটা ছেড়ে গেলেও অলৌকিকের নেশাটা আরও বেশি করে চেপে ধরে পাভেল নামক একটি যুবকের সংস্পর্শে এসে। পাভেল আসলে ইউক্রেনের অধিবাসী, তবে দু'পুরুষ ধরে আমেরিকার নাগরিক। পাভেলের এই বিষয়ে শুধু আগ্রহ নয়, যথেষ্ট পড়াশোনা আছে। সে ওকে বলে যা উইলিয়াম খুঁজছে তা এখানকার এই উইচ সার্কল, উইক্কান বা পাগানদের কাছে পাওয়া মুশকিল। এদের মধ্যে সত্যিই যারা এই প্রাচীন বিদ্যা জানে তারা নিজেদের জাহির করে না, তাদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অলৌকিক শক্তি পেতে গেলে তাকে যেতে হবে তিব্বত, নেপাল কিংবা ভারত। সেখানেই এখনও পাওয়া যেতে পারে অলৌকিক শক্তির মানুষ যারা প্রেতজগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, বিদেহী আত্মা আবাহন করতে পারে এবং তোমাকে এক অন্য দুনিয়ার সন্ধান দিতে পারে। পাঁচ মাস আগে সে ইন্ডিয়ার দিল্লি হয়ে হরিদ্বারে আসে। অনেক মঠ মন্দির ঘোরে কিন্তু কেউ ওকে বিশেষ পাত্তা দেয় না। হৃষিকেশে আর এক আমেরিকানের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। গঙ্গার ধারে বসে গাঁজা খেতে খেতে সে তাকে তিব্বতি তন্ত্র সম্পর্কে কিছু খবর দেয়। তখন তার মনে হয় সে যা খুঁজছে তা পেতে হলে

নেপাল বা তিব্বতে যেতে হবে।”

ফোনে কথা বলতে বলতে ইন্সপেক্টর প্রধান হঠাৎ ব্যস্ত গলায় বলেন, “সরি বিনয়জি, একটা কিছু এমারজেন্সি হয়েছে। আমাকে এখুনি বেরোতে হবে। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। আমি সন্ধ্যার সময় আটটার পর ফ্রি থাকব” লাইন কেটে দিলেন ইন্সপেক্টর।

প্রফেসর দাশগুপ্ত পুঁথির ফোটোকপি করা পাতাগুলো অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। যখন মুখ তুলে বিনয়বাবুর দিকে তাকালেন তাঁর মুখে অপার বিস্ময়।—“এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে বিনয়? এ তো অসাধারণ একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন। অবশ্য যদি জেনুইন হয়। জাল পুঁথি, থাঙ্কা তো নেপালে অনেক পাওয়া যায়। এত ভালো নকল যে বিশেষজ্ঞ ছাড়া ধরতে পারবে না। পুঁথিটা কবে হাতে পাবে?” বিনয়বাবু বললেন “তার আগে আমার কথা শুনুন” গত কয়েকদিনের ঘটনা, পুঁথিটা কেনা থেকে আজ সকালে ইন্সপেক্টর প্রধানের সঙ্গে ফোনে যা যা কথা হয়েছে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বললেন বিনয়বাবু, কিছু বাদ না দিয়ে। লামা এবং সেই রহস্যময় সন্ন্যাসীর সাবধানবাণীও বাদ দিলেন না। সব শুনলেন প্রফেসর পাইপে টান দিতে দিতে। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। তারপর বললেন ... “পুঁথিটা অত্যন্ত মূল্যবান। বেচারা দোকান-মালিক এর গুরুত্ব বা দুষ্প্রাপ্যতা বোধ হয় বুঝতে পারেনি তাই তোমাকে বলতে গেলে জলের দামে বিক্রি করেছে। কোন বিদেশী সংগ্রাহক বা মিউজিয়াম এটার জন্য হাজার হাজার ডলার দিতে পারে। তার জন্য মানুষ খুন হওয়া বিচিত্র নয়।” বিনয়বাবু অবাক হয়ে বললেন, “তার মানে আপনি বলছেন এর মধ্যে কোন অপ্রাকৃত ব্যাপার নেই?”

—“না আমি কিছুই বলছি না। পৃথিবীতে এখনও অনেক কিছু ঘটে যার আমরা কোন ব্যাখ্যা দিতে পারি না। তোমার যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে তা আমার কাছেও বিচিত্র। কিন্তু পুঁথিটা সম্বন্ধে শোন ... এটা প্রাচীন তিব্বতি হরফে লেখা আমি বুঝতে পারছি, যদিও আমি সে ভাষা পড়তে পারি না। যে সমস্ত বিকট চেহারার ছবি আঁকা আছে তা দেখে মনে হচ্ছে এটা ‘ব্ল্যাক বন’ ধর্মের ভূত প্রেত অপদেবতা আবাহন করার মন্ত্র আছে। সেটা আমাকে তত অবাক করেনি। আমার অদ্ভুত লাগছে দুটো জিনিস ... প্রথম হল, প্রতি পৃষ্ঠার পাশে মার্জিনে যে ভাষায় লেখা আছে সেটা আমার চেনা ... এটা ফ্রিজিয়ান

(Phrygian) হরফ। দ্বিতীয় যেটা আমাকে অবাক করেছে সেটা তুমি বললে পুঁথির পাতাগুলো পার্চমেন্ট। দুটোই totally out of place। আর সেই জন্যই বলছি যদি আসল হয় তাহলে এটা যে কোন ঐতিহাসিকের জন্য অমূল্য। বিনয়বাবু অবাক হয়ে বললেন "ফ্রিজিয়ান হরফ? সে তো তুরস্কের প্রাচীন সভ্যতার ভাষা। তিব্বতি পুঁথিতে কী করে আসবে?" তাছাড়া যতদূর জানি তিব্বতি লিপি তো অত পুরনো নয়। ফ্রিজিয়ান সভ্যতা তো আরও প্রাচীন"।

—"সেই জন্যই তো আশ্চর্য হচ্ছি" একটা আতস কাচ দিয়ে লেখাগুলো দেখতে দেখতে মন্তব্য করলেন প্রফেসর। —"কী বিষয়ে লেখা আছে বুঝতে পারছেন কিছু?"

—"মাটার কুবেলি বা মাটার কুবেলিয়া নামটা শুনেছ কখনও?" প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলেন। বিনয়বাবুকে মাথা নাড়তে দেখে আবার প্রশ্ন করলেন ... "গ্রিক মাতৃদেবী 'সিবেলি'র নাম নিশ্চয়ই জান? যার থেকে রোমান দেবী 'ম্যাগনা মাটার', সব রোমান দেবতাদের মা যাঁকে মনে করা হয়?" এ নামগুলো বিনয়বাবুর পরিচিত। বললে "হ্যাঁ জানি। সিবেলি তো সিংহবাহিনী মাতৃদেবী, আমাদের মা দুর্গার মতো।" প্রফেসর হাসলেন "হ্যাঁ, কিন্তু প্রচুর অমিলও আছে। সিবেলি দেবী খুব সম্ভব ফ্রিজিয়ানদের মাটার কুবেলি থেকে উদ্ভব। মাটার কুবেলি মানে 'পর্বত মাতা'। আবার তুমি এখানে পার্বতী'র সঙ্গে মিল পাবে। মাটার কুবেলি ছাড়া ফ্রিজিয়ানরা আর কোন দেবদেবীর পূজা করত বলে জানা যায়নি। এই পুঁথির প্রতি পৃষ্ঠার মার্জিনে মাটার কুবেলির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা আছে। ওপর ওপর যা দেখলাম তার অর্থ মহাদেবী কুবেলি'র কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে দানব, প্রেত, অশুভ শক্তির থেকে পৃথিবীকে রক্ষা কর" বিনয়বাবু বললেন "আশ্চর্য তো। একই জায়গায় অশুভ শক্তির আবাহন করার মন্ত্র, আবার তাদের থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রার্থণা?

"সেই জন্যই তো বলছি এ এক অমূল্য পুঁথি। কবে তোমার হাতে এসে পৌঁছবে তার জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকব।"

সন্ধ্যাবেলা ইন্সপেক্টর প্রধানের সঙ্গে আবার ফোনে কথা হল। অত্যন্ত চিন্তিত মনে হল তাঁকে। আজ দুপুরে একজন তিব্বতি লোক হাসপাতালে উইলিয়ামের সঙ্গে দেখা করতে চায়। রিসেপশনে আটকালেও সে সবার চোখ

এড়িয়ে ওপরে উঠে আসে। সৌভাগ্যবশত উইলিয়ামের কেবিনের সামনে একজন বন্দুকধারী কনস্টেবল পাহারায় ছিল। সে এই লোকটাকে আটকায়, চেঁচামেচিতে আরও অনেকে দৌড়ে আসে। লোকটার কাছ থেকে একটা কুকরি পাওয়া গেছে। অনেক ধস্তাধস্তির পর তার হাতে হাতকড়া পরানো সম্ভব হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

তার থেকে অনেক বেশি চিন্তার বিষয় হল, আজ দুপুর থেকে মনীশকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দোকান থেকে বেরিয়েছিল মোটরবাইক নিয়ে বাড়িতে খেতে যাবার জন্য। বেরিয়েছিল দুটো নাগাদ, কিন্তু বাড়িও পৌঁছয়নি, দোকানেও ফেরেনি। মোবাইল বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সারা কাঠমান্ডুতে তাকে খোঁজা হচ্ছে।

কালীকিঙ্কর কলকাতায় আছে। বিনয়বাবু তার কাকার বাড়ীতে ফোন করে জানতে পারলেন যে দুদিন হল সে এসেছে। খুব কাহিল চেহারা, সম্ভবত ভালো করে খাওয়া জোটেনি অনেক দিন। এসে পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটাচ্ছে। নিঃসন্তান এই বৃদ্ধ কাকা উড়নচন্ডি ভাইপোকে চিরকালই স্নেহ করেন। কাকিমাও ওকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসেন। বিনয়বাবু ফোন করেছেন বলে কাকা কালীকে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙালেন। বেলা দশটার সময় বিছানা থেকে উঠে ঘুম ঘুম গলায় কালী বলল "কে বিনয়? শোন, তুই চলে আয় এখানে। অনেক দিন দেখা হয়নি। আড্ডা মারা যাবে ... আমি কাকিমাকে বলে দিচ্ছি তুই দুপুরে এখানেই খাবি। আর শোন ... আসার সময় এক প্যাকেট ভালো সিগারেট আনিস আমার জন্য" বিনয়বাবু কোন কিছু বলার আগেই লাইন কেটে দিল সে। অগত্যা বিনয়বাবু বেরোলেন কালীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। নিজে সিগারেট খান না, দোকানে জিজ্ঞাসা করে ভালো সিগারেট কিনলেন এক প্যাকেট। তারপর রওয়ানা হলেন যাদবপুরের উদ্দেশ্য। মনীশের ব্যাপারে চিন্তায় ছিলই, তাই ট্যাক্সিতে বসে ইন্সপেক্টর প্রধানকে ফোন করলেন। প্রধান ভালো খবর দিলেন ... মনীশকে পাওয়া গেছে, তবে আহত অবস্থায় ... কাঠমান্ডু থেকে কিছুটা দূরে 'বনেপা' নামক জায়গায়, চলন্ত গাড়ি থেকে ওর অপহরণকারীরা রাস্তায় ধারে ঠেলে ফেলে দিয়ে যায়। ওর কাছে যে খবর পাওয়া গেল তাতে সমস্যা আরও জটিল হয়ে গেল ইন্সপেক্টরের জন্য। গতকাল মনীশ যখন মোটরবাইকে বাড়ি

যাবে বলে রওয়ানা দিয়েছে, দোকান থেকে কিছুটা দূরে মুখ চেনা একজন লোক হাত দেখিয়ে ওকে থামায়। তারপর সে বলে দুজন বিদেশি মানুষ ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়, ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার জন্য। মনীশ এখন বাবার জায়গায় দোকানে বসছে। আগেও বাবাকে সাহায্য করত, কাজেই বইয়ের ব্যবসা সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা নেহাত মন্দ নয়। সে জন্য ওদের অন্য যিনি অংশীদার, মনীশকেই দোকানের দায়িত্ব নিতে বলেন। বিদেশী মানুষ কথা বলবে শুনে ওর কোন সন্দেহ হয়নি। বৌদ্ধ ধর্ম, তন্ত্র, পর্বতারোহণের ওপর বই, এসবের জন্য বিদেশিদের আনাগোনা লেগেই থাকে। দুষ্প্রাপ্য বইয়ের খোঁজে আসে অনেকে। আবার কখনও সখনও উইলিয়ামের মতো মানুষ বই, পুঁথি বা থাঙ্কা বিক্রি করতেও আসে। সেসব বই সবসময় সাধু উপায়ে সংগ্রহ করা হয় না বলে অনেকে সোজাসুজি দোকানে আসে না। এই স্বল্প পরিচিত নেপালি লোকটা ওর বাইকের পিছনে বসে কিছুটা দূরে এক গলির মধ্যে ওকে নিয়ে যায়। সেখানে দুজন বিদেশি, একজন শ্বেতাঙ্গ ও অপরজন লম্বা চওড়া এক কৃষ্ণাঙ্গ অপেক্ষা করছিল। গলিটায় একটা পুরনো বাড়ির পিছন দিকে, এরা ছাড়া আর কোন লোকজন ছিল না। মনীশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একজন পিছন থেকে শক্ত কিছু দিয়ে মনীশের মাথায় মারে। মনীশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। যখন জ্ঞান ফেরে তখন দেখে এক নির্জন জায়গায় একটা বড় গাড়ির পিছনের সিটে সে শুয়ে আছে। তার জ্ঞান ফিরতে দেখে দুই বিদেশি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে পুঁথিটার বিষয়ে। তাদের একটাই জ্ঞাতব্য বিষয় ... পুঁথিটা এখন কোথায়, কার কাছে আছে?

মনীশের মনে হয় ও যদি বলে লামার কাছে আছে তাহলে তাঁর বিপদ হতে পারে। লামাকে তার বাবাও খুব শ্রদ্ধা করতেন, সেও করে। তাঁকে বিপদে ফেলার কথা সে ভাবতেই পারে না। সারা সন্ধ্যা ঐ পাহাড় জঙ্গল ঘেরা জায়গায় এই দুজন বিদেশি মদ্যপান করে আর ওর কাছ থেকে কথা বার করার জন্য প্রচুর মারধোর করে। সঙ্গী নেপালিটা গাড়ির চালক, ওর সম্ভবত নিজের দেশের মানুষ বিদেশিদের হাতে এত মার খাচ্ছে দেখে খারাপ লাগছিল। সে ওকে মাঝে মাঝে বোঝাচ্ছিল "যা জানো বলে দাও, নয়তো মারতে মারতে মেরেই ফেলবে হয়তো তোমাকে" শেষ পর্যন্ত আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মনীশ বলে দেয় পুঁথি এখন কোথায় আছে। তখন ওরা

গাড়ি চালিয়ে কিছু দূর গিয়ে রাস্তার ধারে ওকে ঠেলে ফেলে দেয়। মনীশের পাঁজরের একটা হাড় চিড় খেয়েছে, একটা দাঁত ভেঙেছে, মুখ ফোলা, সারা শরীরে কালশিটে পড়েছে ... তা সত্ত্বেও সে লামার জন্য খুব চিন্তিত। তাঁর কথা বলে দিয়েছে বলে অপরাধবোধেও ভুগছে। ইন্সপেক্টরের কাছে এত লোকবল নেই যে লামার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করা যাবে। তবে লামা খুব চিন্তিত নন এই খবর শুনে। তাঁর মনাস্টারিতে অনেক লোকজন। সেখানে দুজন বিদেশি বিশেষ কিছু করতে পারবে বলে তিনি মনে করেন না। আর পুঁথিটা এমন গোপন জায়গায় আছে সেটা তাদের খুঁজে বার করা অসম্ভব। এইবার ইন্সপেক্টর প্রধান উইলিয়ামের স্বীকারোক্তির শেষ ভাগটা বললেন, যেটা আগের দিন কোন জরুরী কাজ এসে গিয়েছিল বলে পুরোটা বলতে পারেননি। হৃষীকেশে স্টিভ নামে যে আমেরিকানের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, সেটা খুব শীঘ্রই বন্ধুত্বে পরিণত হয় দুজনের একই বিষয়ে আগ্রহ থাকার জন্য। তবে স্টিভের তন্ত্র সম্পর্কে পড়াশোনা উইলিয়ামের থেকে একটু বেশি। সে তিব্বতি তন্ত্রের কিছু খবর রাখে। কিন্তু দুজনেরই তন্ত্রের গভীরে যাবার মতো মানসিকতা বা ধৈর্য্য নেই। তাছাড়া তারা খুঁজছে এমন কিছু ক্ষমতা যা তাদের অলৌকিক শক্তি দেবে। কিন্তু সে জন্য যে সাধনার প্রয়োজন সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। বেশিরভাগ আমেরিকানদের মতো সব কিছু তাৎক্ষনিক চাই তাদের। বেশ কয়েকটি মনাস্টারিতে তান্ত্রিক লামাদের সংস্পর্শে আসে তারা দুজন। কিন্তু কোথাও তারা যা খুঁজছে তা সহজে পাওয়ার কোন পথ কেউ দেখায় না। শেষ পর্যন্ত তারা উত্তর নেপালের মুস্তাং অঞ্চলে এক মনাস্টারিতে পৌঁছয়, যেখানে গোপনে এখনও প্রাচীন ব্ল্যাক বন ধর্মের চর্চা করা হয়। এই ধর্ম সম্পর্কে উইলিয়াম আগে কিছুই জানত না, স্টিভ নামটা শুনেছিল মাত্র। এখানে যারা ছিল তারা খুব আগ্রহের সঙ্গে এই দুই বিদেশীকে ডেকে নেয়, তাদের পুরনো জরাজীর্ণ মনাস্টারিতে থাকতে দেয়। প্রথম দিনই একটা জিনিস একটু বিসদৃশ লাগে স্টিভের, মনাস্টারির কোথাও বুদ্ধের মূর্তি বা ছবি নেই, নেই কোন বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিও। যেসব বিকট, বিভৎস ছবি দেওয়াল জুড়ে আছে সেগুলো দেখলে ভয় করে। প্রথম দুদিন স্টিভ আর উইলিয়ামকে এরা খুব খাতির যত্ন করে, কিন্তু ভাষার সমস্যার জন্য ভাব বিনিময় কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তৃতীয় দিনে একজন

বয়স্ক মানুষ বাইরে থেকে আসে। তাকে দেখে সবাই যেরকম শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করে তাতে এদের মনে হয় ইনি সম্ভবত এদের প্রধান। এই বয়স্ক মানুষটি, যার নাম দোরজে, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে এদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে। এই প্রথম একজনের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পেরে এরাও অনেকটা সহজ বোধ করে। এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছে সেটা স্টিভ, দোরজেকে খুলে বলে। দোরজে ওদের সাহায্য করবে বলে কথা দেয়। পরদিন রাত্রে ওদের মনাস্টারির মাটির নিচের একটা স্যাতস্যাঁতে ঘরে নিয়ে যায় দোরজে ও আরও কয়েকজন। সেখানে এক ভয়াল দর্শন মূর্তি ছিল। তার সামনে আগুন জ্বালা হয়। তারপর সবাই গোল হয়ে ঐ অগ্নিকুন্ড ঘিরে বসে। দোরজে একটা কারুকার্য করা কাঠের বাক্স থেকে সিল্কের কাপড়ে মোড়া পুঁথিটা বার করে আনে। তারপর ওদের দুর্বোধ্য এক ভাষায় অদ্ভুত সুরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে। মাঝে মাঝে আগুনের মধ্যে কী সব জিনিস ঢালা হয়, আগুন আরও জোরে জোরে জ্বলে ওঠে। একটা কটু গন্ধে ঘর ভরে যায়। এরপর একটা মাটির পাত্র থেকে ছোট ছোট চিনেমাটির পাত্রে এক রকম তরল ঢেলে ওদের পান করতে দেওয়া হয়। চারিদিকের এইরকম আধিভৌতিক পরিবেশের জন্য ওরা একটা ঘোরের মধ্যে ছিল, না হলে লক্ষ্য করত যে ওরা যখন পাত্র মুখে তুলেছে ঘরের বাকি সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। পাত্রের তরলটায় বেশ দুর্গন্ধ, তাই দুজনেই এক চুমুকে শেষ করল। অত্যন্ত কড়া কোন দেশি সুরা মনে হল, গলা জ্বলে গেল ওর। উইলিয়ামের মনে হল দোরজে'র ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি খেলে গেল। মন্ত্রোচ্চারণ আরও জোরালো হয়ে উঠল, ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেল ... একটু পরেই স্টিভ আর উইলিয়াম অচেতন হয়ে যায়। উইলিয়াম জানে না কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফেরে। সম্ভবত খুব বেশিক্ষণ সে অচৈতন্য অবস্থায় ছিল না। বহু রকমের নেশা করা অভ্যাস ছিল তার, এই তরল তাদের অজ্ঞান করার জন্য দেওয়া হলেও তার ওপর বেশি কাজ করেনি। চোখ খুলে তার মনে হল সে ঘরের এক কোণে শুয়ে আছে, ঘর ভর্তি ধোঁয়া, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মতো কটু গন্ধ ... মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে এখন সমবেত কণ্ঠে। ঘরে যে বিকটদর্শণ মূর্তিটা ছিল তার সামনে একটা নিচু বেদির মতো ছিল যেটা আগে চোখে পড়েনি উইলিয়ামের। সেই বেদির ওপর একটা নগ্ন দেহ মানুষ শুয়ে

আছে ... ধোঁয়ার জন্য ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, ... তারপরই মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল উইলিয়ামের। মানুষটা তো তার বন্ধু স্টিভ। উইলিয়ামের দিকে পিছন করে একজন স্টিভের শরীরের ওপর ঝুঁকে আছে, সে কি দোরজে? অন্য সবাই দুদিকে জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সবার দৃষ্টি মূর্তিটার দিকে ... কী করছে ওরা? হঠাৎ দোরজে দুটো হাত মাথার ওপর তুলল, হাতে একটা ভোজালি, আগুনের আভায় চকচক করছে ... তারপরই ক্ষিপ্রবেগে ভোজালিটা দিয়ে স্টিভের শরীরের ওপর আঘাত হানল দোরজে। স্টিভের শরীরটা একবার কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল। উইলিয়ামের গলা থেকে তার অজ্ঞাতসারেই একটা আর্তনাদ বেরিয়ে গিয়েছিল ... দোরজে আর তার দলবল মন্ত্রের আওয়াজ আর নিজেদের কাজে মগ্ন থাকায় সম্ভবত শুনতে পায়নি। আতঙ্কে সমস্ত শরীর জমে গিয়েছিল উইলিয়ামের ... তাহলে এই উদ্দেশ্যেই ওদের এত খাতির করে রেখেছে এখানে ... ওদের দেবতার কাছে বলি দেবার জন্য? প্রাণ বাঁচানোর প্রবল ইচ্ছে উইলিয়ামের শরীরে যেন এক অদম্য শক্তি এনে দিল ... একটাই কথা তার মাথায় মধ্যে এখন কাজ করছে ... যে করেই হোক পালাতে হবে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল অগ্নিকুণ্ডের পাশে সেই তরলের পাত্র আর আগুনের মধ্যে যে জিনিস ঢালা হচ্ছিল তার পাত্রটা রাখা আছে। আর একদিকে রাখা আছে ঐ পুঁথিটা। এখন আর মন্ত্রোচ্চারণ পুঁথি দেখে হচ্ছে না ... সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর ঐ মূর্তির দিকে, আর একঘেয়ে সুরে একটা কথা বার বার বলছে। এবার দোরজে নিচে থেকে একটা বড় পাত্র ওঠাল, সম্ভবত স্টিভের রক্ত আছে তার মধ্যে ...। উইলিয়ামের মনে হল, মূর্তিটা জীবন্ত হয়ে উঠছে যেন ... যেন তার চোখ দিয়ে আলো বার হচ্ছে ... আলো আঁধারিতে চোখের ভুলও হতে পারে। কারোর দৃষ্টি ওর দিকে নেই দেখে উইলিয়াম চুপিসাড়ে উঠল। তারপর একটা পাত্র থেকে কালো রঙের গুঁড়ো যে জিনিসটা ছিল সেটা সবটাই আগুনের মধ্যে ঢেলে দিল। মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় ভরে গেল সারা ঘর। এবার পুঁথিটা কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে পাত্রের তরলটাও সবটা উল্টে দিল আগুনের পাশে। দাউদাউ করে লেলিহান আগুন জ্বলে উঠল, তরলের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখাও ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। মন্ত্র পড়া তখন থেমে গেছে, ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে থেকে দোরজের দলবলের ভীত কোলাহল শোনা যাচ্ছে।

উইলিয়াম ওর মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে উপরে ওঠার সিঁড়িটা পেয়ে গেল। পুঁথিটা হাতে নিয়ে দু-ধাপ ওঠার পরই পিছন থেকে একটা অমানুষিক বিকট গর্জন শুনে পিছনে তাকিয়ে উইলিয়াম দেখে মূর্তিটা যেন জীবন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ধারালো নখ সমেত হাতের আঙুলগুলো যেন তার টুঁটি ছিঁড়ে নেবার জন্য উদ্যত। এরপর উইলিয়াম কীভাবে মনাস্টারি থেকে বেরিয়েছে তার মনে নেই। প্রাণপন দৌড়েছে অন্ধকারে, বার বার হোঁচট খেয়েছে, পড়ে গিয়ে কেটে ছড়ে গেছে। কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে শুধু দৌড়েছে দূরে একটা লোকালয়ের দু-একটা ক্ষীণ আলো লক্ষ্য করে। সব সময়ই মনে হয়েছে পিছনে কারা যেন ধাওয়া করে আসছে, তারা মানুষ নয়, তাদের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে একটা সাদা চোর্তেন চোখে পড়তে সেদিকেই দৌড়য় উইলিয়াম। আশে পাশে কিছু ছোট ছোট বাড়িও দেখা যায়, আর একটা সাদা রঙ করা মনাস্টারি, তারা দেওয়ালে আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে তথাগত বুদ্ধের মূর্তি করুণাঘন চোখে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছেন। উইলিয়ামের মনে হল, সারা পৃথিবীতে এই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। মূর্তির কাছে পৌঁছে অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

উইলিয়ামকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে গ্রামের লোকেরা আর বৌদ্ধ লামারা ওকে তুলে নিয়ে এসে শুশ্রুষা করে কিছুটা সুস্থ করে তোলে। তার সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে এসেছিল ঐ শয়তানি আড্ডায়। শুধুমাত্র একটা পাতলা চামড়ার ব্যাগ, তাতে ওর পাসপোর্ট থাকে, সেটা জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে ছিল। টাকা পয়সা, ক্রেডিট কার্ড সবই ওর ব্যাকপ্যাকেই পড়ে আছে ঐ বন মনাস্টারিতে। যে গ্রামে ও আশ্রয় পেয়েছিল তার বাসিন্দারা বেশিরভাগ বৌদ্ধ। ভাষা সমস্যা এখানেও ছিল। তবে আজকাল কেউ কেউ এই অঞ্চল ট্রেকিং করতে আসে বলে গ্রামের দু-একজন যুবক তাদের গাইড হিসেবে কাজ করে। সে সূত্রে তারা কাজ চালানোর মতো ইংরেজি শিখেছে। তারা ওকে খুব সাহায্য করে। তাদের মুখে শোনে পাশের গ্রাম থেকে দূরে যে পুরনো মনাস্টারি আছে সেখানে আগুন লেগেছিল, তাতে দুজন লোক পুড়ে মারা গেছে। তারা এও বলে ঐ মনাস্টারির লোকেরা একজন বিদেশিকে খুঁজছে। অবশ্য এখানকার লোকেরা ঐ বন মনাস্টারির মানুষদের পছন্দ করে না। উইলিয়াম এই কথা জানার পর এই জায়গায় আর থাকা নিরাপদ মনে

করল না। সামান্য কিছু নেপালি টাকার বিনিময়ে ওর হাতঘড়িটা গ্রামের একমাত্র দোকানদারকে বিক্রি করে ও বেরিয়ে পড়ে গ্রাম থেকে। গ্রামের একজন ওর সঙ্গে যায় সাত কিলোমিটার দূরে বাসরাস্তা পর্যন্ত। কাঠমান্ডু এসে পৌঁছতে ওর তিন দিন লাগে। এই তিন দিন ও ঘুমোতে পারেনি। যখন যেখানে ঘুমোতে চেষ্টা করেছে, নানা রকম ভয়ঙ্কর মূর্তি এসে হানা দিয়েছে স্বপ্নের মধ্যে। অথচ ও যখন মনাস্টারির লামাদের আশ্রয়ে ছিল তখন এরকম দুঃস্বপ্ন দেখেনি, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে সেখানে। রাস্তায় এক রাত এক গ্রাম-আধা শহর জায়গায় বাসস্ট্যান্ডে রাত কাটাতে হয়েছে। রাত নটার পর এসব প্রত্যন্ত অঞ্চল নির্জন হয়ে যায়। সাদা চামড়ার লোক বলে টিকিট ঘরে রাত কাটানোর অনুমতি পায় উইলিয়াম। সারা রাত বাইরে ভারী পায়ের আওয়াজ পেয়েছে সে, সঙ্গে জান্তব গন্ধ আর অদ্ভুত সব আওয়াজ। জানলা দিয়ে বাইরে তাকানোর সাহস হয়নি তার। তার মনে হয়েছে, এই পুঁথিটার জন্য বোধহয় অশরীরীরা ওর পিছু নিয়েছে। কোনক্রমে কাঠমান্ডু পৌঁছে পুঁথিটা বিক্রি করে নিশ্চিন্ত হয়েছে সে। কিন্তু এ কদিনের দুশ্চিন্তা, অনাহার অর্ধাহারে অসুস্থ হয়ে পড়ে উইলিয়াম। কী করে পশুপতিনাথ মন্দির পৌঁছেছে মনে নেই। মন্দির চত্বরেই অর্ধচেতন অবস্থায় পড়েছিল যখন পুলিশ ওকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে।

কালী বিনয়বাবুকে দেখে খুব খুশি হল। বলল "আয় বস। চা খাওয়া যাক আগে।" বিনয়বাবু বললেন "এত বেলায় চা? আবার কাকিমাকে বিরক্ত করবি তো?"

— "না রে, কাজের লোক আছে। সেই করবে। চায়ের সঙ্গে সিগারেট খাব একটা"। বিনয়বাবুর মুখে আনুপর্বিক ঘটনা শুনল কালী। শুনতে শুনতে দু-একটা প্রশ্নও করল। সব কিছু শোনার পর একটু চিন্তিত লাগল তাকে। বলল "দেখ, আমি তো দাশগুপ্ত স্যারের মতো অত পন্ডিত না, এ পুঁথির রহস্য উদ্ধার আমার কর্ম নয়। তবে একটা কথা মনে হচ্ছে ... এই যে বললি, প্রতি পাতার মার্জিনে মাতৃদেবীর কাছে প্রার্থনা লেখা অশুভ শক্তির থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ... এটার অর্থ আমি কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। তুই তো বললি সেটা অন্য কোন প্রাচীন, অধুনালুপ্ত ভাষায় লেখা। তার মানে এই পুঁথিটা কোন সময় শুভ বোধ সম্পন্ন কিছু মানুষের হাতে পড়েছিল, যারা

বুঝতে পেরেছিল পুঁথিটা খারাপ লোকের হাতে পড়লে সর্বনাশ হবে। তাই মাতৃদেবীর আরাধনার মন্ত্র লেখা তার মধ্যে। ঐ অজানা ভাষার মন্ত্র কতদূর কার্যকর এই ভয়ঙ্কর সব অপশক্তির বিরুদ্ধে তা আমার জানা নেই। তবে একটা সহজ কথা আমি বুঝি, সেই আদিকাল থেকে মানুষ বিপদের সময় মায়ের কাছেই আশ্রয় নিয়ে এসেছে। আমি তো মায়ের ভক্ত। কাজেই এটা আমি বুঝতে পারছি। বিনয়বাবু বললেন—"কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে পুঁথিটা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেদের হাতে থাকেনি, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে"।

ইন্সপেক্টর প্রধানের মাথায় অনেক দুশ্চিন্তা। যে লোকটা কুকরি সমেত উইলিয়ামের হাসপাতালে ধরা পড়েছে সে যে উইলিয়ামকে খুন করতেই এসেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকটার কাছ থেকে কোন কথা বার করা যায়নি, থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগেও না। তবে লোকটার কথার টানে বোঝা গেছে যে, সে মুস্তাং অঞ্চলের লোক। উইলিয়ামের স্বীকারোক্তির পর বোঝা যাচ্ছে সে লোকটাকে দোরজে বা তার গোষ্ঠীর লোকেরাই পাঠিয়েছে। যে ঘটনা সেখানে ঘটেছে তাতে ওদের উইলিয়ামের ওপর প্রচন্ড রাগ থাকা স্বাভাবিক। প্রধানের দুশ্চিন্তা দোরজের বিষয়ে শোনার পর অনেক বেশি বেড়ে গেছে। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস, দোরজের কাছে কিছু অলৌকিক শক্তি আছে। না হলে এই লোক জানল কী করে উইলিয়াম কোথায় আছে! মনীশের বাবার মৃত্যুটাই তো একটা অতিপ্রাকৃত ঘটনা। বন্ধ দোকানের মধ্যে কীভাবে ভদ্রলোক এরকম নৃশংস ভাবে খুন হলেন? উইলিয়ামের ওপর যাতে আক্রমণ আর না হয় তার জন্য কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন প্রধান। তাঁর দায়িত্বে থাকা আমেরিকান নাগরিক যদি খুন হয় জবাবদিহি করতে করতে তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে, চাকরি যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। দুদিন পর উইলিয়াম নিজের দেশে ফিরে গেলে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হবেন। ততক্ষণ সাবধান থাকতেই হবে। তবে উইলিয়ামের ওপর দোরজের লোকের আক্রমণ নিছক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। তার থেকে ওরা অনেক বেশি মরিয়া হবে পুঁথিটা উদ্ধার করতে। দোরজে নিশ্চয়ই তার অলৌকিক শক্তি দিয়ে জানতে পেরেছে পুঁথিটা এখন লামার কাছে। লামার ওপরে কোন আক্রমণ না হয়। অবশ্য লামার কোন ক্ষতি অপদেবতা বা প্রেত করতে পারবে না। কিন্তু পুঁথিটা যখন কলকাতায় বাঙালিবাবুর কাছে পাঠানো হবে তখন ওরা সেটা হাত করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে। বাড়তি

ঝামেলা এসেছে ঐ দুই আমেরিকান যারা পুঁথির লোভে মনীশকে অপহরণ করেছিল। কাঠমান্ডুর সব হোটেলে খোঁজ করা হচ্ছে তাদের। মনীশের বর্ণনা অনুযায়ী নেপালি ড্রাইভার এবং একটা বড় গাড়িরও খোঁজ করা হচ্ছে।

সেই রাতে ইন্সপেক্টর প্রধানের দুশ্চিন্তা চতুর্গুণ করার মতো দুটো ঘটনা ঘটল।

তালাবন্ধ হাজতের মধ্য থেকে দোরজের পাঠানো আততায়ী অদৃশ্য হয়ে গেল। তাকে কড়া পাহারায় একা একটা ছোট কুঠরিতে রাখা হয়েছিল। প্রহরী পাঁচ মিনিটের জন্য প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে কুঠরি খালি। অথচ বাইরে আসার একমাত্র দরজা তালাবন্ধ। দ্বিতীয় ঘটনায় দুজন বিদেশি রিভলবার দেখিয়ে লামার মনাস্টারিতে ঢোকার চেষ্টা করে গভীর রাতে। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল না সেখানে কতজন লোক থাকে। বহু লোকের গলার হৈ চৈ শুনে আশপাশের জনবসতির সবাই উঠে পড়ে। সবাই মনাস্টারিতে দৌড়ে আসে। বেগতিক দেখে এই দুজন পালিয়ে যায়। পরিস্থিতি শান্ত হলে সবাই যে যার ঘরে ফিরে যায়, চারজন অল্প বয়সী লামা দরজার পাহারায় থাকে। তারা ভোর রাত্রের দিকে অদ্ভুত দর্শন কিছু ছায়ামূর্তি দেখেছে মনাস্টারির আশেপাশে। তারা কিছু বুঝতে না পারলেও, লামা তাদের মুখে এ কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

লামা যখন জানতে পারলেন, উইলিয়ামের সম্ভাব্য আততায়ী জেলের বন্ধ কামরার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে উনি আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ইন্সপেক্টর প্রধানকে বললেন "আমার ধারণা ঐ আমেরিকান ছেলেটির ওপর আবার একবার আক্রমণ হতে পারে, আর সেটা এবার কোনো মানুষের হাত দিয়ে নাও হতে পারে। লামা ইন্সপেক্টরকে এক টুকরো কাপড় দিলেন যার মধ্যে কিছু মন্ত্র লেখা আছে। আর একটা শিশি ভর্তি জল দিলেন। বললেন — "এই কাপড়টা ওর বালিশের নিচে রেখে দেবেন আর শিশির জলটা ওর ঘরের মধ্যে সব জায়গায়, জানলায় এবং দরজার বাইরে ছিটিয়ে দেবেন। সবচেয়ে ভালো হয় উইলিয়াম যদি সবসময় মনে মনে "ওম মনিপদ্মে হুম' মন্ত্র জপ করে"। ইন্সপেক্টর প্রধান ভক্তিভরে সব কিছু লামার হাত থেকে নিলেন, কথা দিলেন লামা যেরকম নির্দেশ দিয়েছেন সেরকমই হবে। মনাস্টারি থেকে ফেরার সময় আমেরিকান দূতাবাসের সুরক্ষা বিভাগের

প্রধানকেও জানালেন জেল থেকে কয়েদি উধাও হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য সেই আমেরিকান প্রাক্তন সৈনিকটি অলৌকিক কিছু বিশ্বাস করল না। স্পষ্ট ভাষায় ইন্সপেক্টরকে জানিয়ে দিল যে নেপালি পুলিশের অকর্মন্যতার জন্যই কয়েদি পালাতে পেরেছে এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস জেলের প্রহরীরাও এর সঙ্গে জড়িত। তৎক্ষণাৎ দূতাবাসের এক সশস্ত্র প্রহরীকে পাঠানো হল হাসপাতালে উইলিয়ামের সুরক্ষার জন্য। প্রধান বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে দুজন স্টেনগানধারী গোর্খা প্রহরী পালা করে উইলিয়ামকে পাহারা দিচ্ছে, কিন্তু আমেরিকান লোকটি তাচ্ছিল্য সহকারে তাঁর কথা উড়িয়ে দিল। একদিক দিয়ে প্রধান একটু নিশ্চিন্ত হলেন, কারণ কিছু হলে তাঁর ওপরেই সম্পূর্ণ দোষ পড়বে না। আমেরিকান দূতাবাস উইলিয়ামের জন্য হাসপাতালে আলাদা করে প্রহরী পাঠাচ্ছে মানে উইলিয়াম কোন ভি আই পি'র ছেলে ... এরকমটাই আন্দাজ করে নিলেন ইন্সপেক্টর। তাঁর অনুমান খুব একটা ভুল নয় ... উইলিয়ামের বাবার ভালোই যোগাযোগ আছে ওয়াশিংটনে, সেই জন্য দূতাবাসের ওপর যথেষ্ট চাপ আছে এই ছন্নছাড়া ভবঘুরে ছেলেটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। হাসপাতালে পৌঁছে প্রথমেই মন্ত্র লেখা কাপড়ের টুকরোটা উইলিয়ামের বালিশের নিচে রেখে দিলেন। উইলিয়াম, গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার ফলে সহজেই রাজি হয়ে গেল। 'ওম মনিপদ্মে হুম' উচ্চারণ করতে একটু অসুবিধা হলেও বলল মনে মনে ওই মন্ত্র জপ করে যাবে। শিশি'র মন্ত্রপূত জল ছড়ানো শেষ হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমেরিকান দূতাবাস থেকে দুজন এসে পৌঁছল। তার মধ্যে একজন সুরক্ষা বিভাগের প্রধান, অত্যন্ত উন্নাসিক ... কিছুই তার মনমত নয় এবং সব বিষয়ে বাঁকা মন্তব্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আমেরিকানদের তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের সঙ্গে এইরকম অভদ্র ব্যবহার ইন্সপেক্টরের কাছে অপরিচিত নয়। দ্বিতীয় লোকটা সৈনিক, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ... সে কোন কথা না বলে ঘুরে ঘুরে সব দেখছিল ... বোধ হয় বোঝার চেষ্টা করছিল কোথা থেকে আততায়ী আক্রমণ করতে পারে। দরজার সামনে দাঁড়ানো আগ্নেয়াস্ত্র ও কুকরি ধারী গোর্খার দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না। যোদ্ধা হিসেবে যে গোর্খাদের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি, বোধহয় তার অজানা। সুরক্ষা প্রধান উইলিয়ামের সঙ্গে দেখা করে তাকে আশ্বস্ত করল এই বলে যে এখন থেকে একজন

আমেরিকান সৈন্য সবসময়ই তার পাহারায় থাকবে, কাজেই তার চিন্তার কোন কারণ নেই। বলা বাহুল্য, উইলিয়াম খুব একটা ভরসা পেল না তার কথায়, যদিও মুখে কিছু বলল না।



টম ম্যাকান আর জেরেমি উডওয়ার্ড মূলত দুর্লভ প্রত্নবস্তুর চোরাকারবারি। টম ম্যাকানের পূর্বপুরুষ দুশো বছর আগে ভাগ্য ফেরাতে আমেরিকায় এসে পৌঁছে ছিল স্কটল্যান্ড থেকে। একসময় তাদের পরিবার যথেষ্ট বিত্তবান হয়ে ওঠে তুলোর চাষ করে। পরিবার বড় হতে থাকে এবং ছড়িয়ে পড়তে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে। টমাস বা টমের বাবা বা ঠাকুরদা কেউই ম্যাকান পরিবারের বিত্ত বা বৈভব খুব একটা ভোগ করতে পারেনি, কারণ তাদের আমলে ম্যাকানদের পড়তির দশা। টম ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে। পড়াশোনায় মাথা থাকলেও মন ছিল না। বাধ্যতামূলকভাবে যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হল, তখন তার ভালোই লেগেছিল সৈনিক জীবন। ইরাক যুদ্ধের সময় প্রত্নবস্তুর চুরিতে তার হাতে খড়ি হয়। সমস্ত ইরাকে বিভিন্ন মিউজিয়ামে ছড়িয়ে আছে মানবসভ্যতার প্রাচীনতম নির্দশন। মিউজিয়ামের বাইরেও আছে সুমেরিয়, আসিরিয়, আক্কাদিয় ও ব্যাবিলনের সভ্যতার অমূল্য সব নিদর্শন। যুদ্ধের কারণে অরাজক ইরাক হয়ে ওঠে প্রত্নচোরদের স্বর্গ। প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত সংগ্রাহকরা অনেকেই কোন নীতির ধার ধারে না। বেশ কিছু মিউজিয়াম আছে, তারাও দুর্লভ কোন জিনিস পেলে বিনা প্রশ্নে চড়া দামে কিনে নেয়। ফলে ইরাক যুদ্ধের সময় অনেক আমেরিকান সৈন্যের ভাগ্য খুলে যায়। টম তাদের মধ্যে একজন। বেশ কিছু প্রত্নবস্তু তার হাত দিয়ে বিদেশে পাচার হয়ে যায় মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে। যুদ্ধের পর সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে এই লাভজনক ব্যবসাটাকেই পুরোপুরি আঁকড়ে ধরে টম। তার প্রত্নবস্তু সম্বন্ধে ধারণাও ছিল, যেটা জেরেমির একেবারে নেই। টম আর জেরেমির বন্ধুত্ব সেনাবাহিনীতেই হয়। ছ-ফুট চার ইঞ্চি লম্বা দশাশই চেহারার জেরেমি সেনা থেকে অবসর নিয়ে পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা হবার চেষ্টা করে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয় না। কৃষ্ণাঙ্গ জেরেমি লেখাপড়াও বিশেষ শেখেনি। ডেট্রয়েটে গাড়ি

কারখানার এক প্রাক্তন শ্রমিকের তৃতীয় সন্তান ছোটবেলায় রাস্তায় ঘুরে ছোটখাটো অপরাধ আর মস্তানি করে সময় কাটাত। ভেবেছিল কোন একটা গাড়ি কারখানায় কায়িক পরিশ্রমের কাজ তো জুটেই যাবে। কিন্তু ডেট্রয়েটে একটার পর একটা গাড়ির কম্পানির কারখানায় লালবাতি জ্বলায় চাকরি আর জেরেমির ভাগ্যে জোটে না। সেনাবাহিনীতে যোগ না দিলে সে হয়তো পুরোদস্তুর অপরাধ জগতেই যোগ দিত। টম যখন জানতে পারে জেরেমি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে বেকার বসে আছে, তখন সে তার 'ব্যবসা'তে যোগ দেবার প্রস্তাব দেয়। জেরেমির যদিও প্রত্নবস্তু সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, তার শারীরিক ক্ষমতা ও অপরাধ প্রবণতা ব্যবসার কাজে লাগবে বলেই টম তাকে সঙ্গে নিয়েছিল। টম আর জেরেমি'র তথাকথিত ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক হলেও বিপদের ঝুঁকি প্রচুর। প্রায় সব দেশই তাদের প্রত্নসম্পদ রক্ষা করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেই এইসব ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বিনা প্রহরায়। তবে চুরি করে ধরা পড়লে কঠোর শাস্তির সম্ভাবনা আছে। কম্বোডিয়ায় এক প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় এরা দুজন। আঙ্কোর ভাট এবং আশেপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন ইউনেস্কো হেরিটেজ, ফলে প্রহরা বেড়েছে এবং দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞ দল ক্রমাগত কাজ করছে ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্নবস্তু মেরামত করার জন্য। এক বছর কম্বোডিয়ার নোংরা দুর্গন্ধ জেলে কাটিয়ে কোনক্রমে এরা ছাড়া পায়। জরিমানা আর ঘুষ দিতে দিতে কপর্দকশূন্য হয়ে দেশে ফিরে আসে দুজন। তারপর থেকে ওরা খুব সাবধান হয়ে গেছে। নেপাল ওদের খুব পছন্দের কর্মস্থল। প্রথম কারণ দুর্নীতি ... বেশিরভাগ সরকারি কর্মচারী ঘুষ নেয়। দ্বিতীয়ত, নেপাল থেকে চোরাই জিনিস সহজে বার করে আনা যায়।

উইলিয়াম যেদিন পুঁথিটা বইয়ের দোকানে বিক্রি করে সেদিন ওরা খবর পায় ওদের চরের মাধ্যমে। কাঠমান্ডুতে ওরা কিছু লোককে অল্প টাকার বিনিময়ে লাগিয়ে রেখেছে, যারা কোন অ্যান্টিক জিনিসের সন্ধান পেলে ওদের জানায়। পুঁথি বিক্রির পরের ঘটনাক্রম ওদের জানা নেই, জানলেও সম্ভবত বিশ্বাস করত না। মনাস্টারি থেকে বিফল হয়ে ফিরে ওদের জেদ আরও বেড়ে গেছে। টমের ধারণা হয়েছে পুঁথিটা খুবই প্রাচীন এবং নিয়ে

যেতে পারলে আমেরিকার ধনী সংগ্রাহকরা মোটা দাম দেবে। তাছাড়া পাথরের মূর্তির মতো ভারী জিনিসের তুলনায় পুঁথি গোপনে পাচার করা অনেক সহজ। ওরা স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতীদের নিয়ে দল ভারী করার চেষ্টা করছে।

কালীকিঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে বিনয়বাবু সন্ধ্যার আগে এসে পৌঁছলেন প্রফেসর দাশগুপ্তর ফ্ল্যাটে। যানজটের জন্য বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হল। আগে থেকে ফোনে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে প্রফেসর দাশগুপ্ত ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দুজনকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন নিজের পড়ার ঘরে। অনতিবিলম্বে এসে গেল ধূমায়িত চায়ের কাপ এবং গরম সিঙ্গাড়া। দাশগুপ্ত বললেন "আমি যতটুকু এখন পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি তা তোমাদের বলছি। আমার ধারণা এই পুঁথির বয়স দু-হাজার বছর বা আরও বেশী। সেটা আমি ফ্রিজিয়ান হরফগুলো দেখে অনুমান করেছি। প্রাচীন তিব্বতি হরফে লেখাগুলো পড়ার একটু চেষ্টা করেছি আমার এক ভাষাবিদ্ বন্ধুর সাহায্যে ... সে আমাকে কিছু বই ধার দিয়েছে। তিব্বতি লেখাগুলো সম্বন্ধে আমার ধারণাই ঠিক মনে হচ্ছে। এতে তিন ধরণের মহাশক্তিধর ও ক্রুর প্রকৃতির অপদেবতাকে আবাহন ও নিয়ন্ত্রণ করার উপায় লেখা আছে। আবাহনের পদ্ধতিতে ভুল হলে কী বিপদ ঘটতে পারে তাও লেখা আছে। এইটুকু আমি এখন পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি তবে বইয়ে প্রাচীনতম তিব্বতি হরফের যা নমুনা আছে; এই পুঁথির লেখা তার সঙ্গেও পুরোপুরি মেলে না। সম্ভবত এ হরফের নিদর্শন-এর আগে কোথাও পাওয়া যায় নি। ফ্রিজিয়ান লেখার বেশ খানিকটা পাঠোদ্ধার করেছি। এর লেখক নিজের পরিচয় দিয়েছে এক জায়গায় 'ব্রিগো দেশের কুবেলি মাতার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মিত্তা বা মিত্ত'। দেশের মানুষের মহা অকল্যাণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মাতা কুবেলি'র আবাহন মন্ত্র লেখা আছে পাতায় পাতায়। তার মধ্যে অবশ্য অনেক শব্দ বেশ দুর্বোধ্য লাগছে"। কালী এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল প্রফেসরের কথা। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল ... "ব্রিগো দেশ মানে? এই যে বলেছিলেন ফ্রিজিয়ান?" "ফ্রিজিয়ানরা নিজেদের ব্রিগো বলত। অনেকে ভৃগু'র সঙ্গে এর মিল খুঁজে পান" মহর্ষি ভৃগু?" আরও অবাক হয়ে বলল কালী। "হ্যাঁ, কিন্তু সে নিয়ে আরও অনেক গবেষণা দরকার। এদের সম্পর্কে আমরা যা জানি খ্রিস্টজন্মের হাজার কি বারোশো বছর আগে আনাতোলিয়া অঞ্চলে এরা

থাকত। এদের প্রধান আরাধ্যা দেবী সিংহবাহিনী কুবেলি থেকে উদ্ভব গ্রীকদের মাতৃদেবী সিবেলি, রিয়া এবং এথিনা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক পর্যন্ত এদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপর সম্ভবত অন্য সব জনজাতির সঙ্গে এরা মিশে যায়। "এই পুরোহিত 'মিত্তা' কোন মহা অকল্যাণের কথা বলছে?" কালী জিজ্ঞাসা করে। "আমি এখনও কাজ করছি ... ফ্রিজিয়ান ভাষা দেড় হাজার বছর ধরে একরকম ছিল না, বিবর্তিত হয়েছে ... সেজন্য সব কিছু বুঝতে পারছি না। তবে আশা করছি আর দিন দশকের মধ্যে পুরো লিপিটার পাঠোদ্ধার করে ফেলব"।

উইলিয়ামকে কাল হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। দূতাবাস তার কাগজপত্র সব তৈরি করে দিয়েছে। কাল বিকালের এমিরেটস ফ্লাইটে দুবাই হয়ে সে নিউইয়র্ক যাবে। আজকের রাতটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে সে। দোরজে যে তার ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। তবে একবার নেপাল থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে আশা করা যায় বিপদ কেটে যাবে। সন্ধ্যাবেলায় অন্য একজন আমেরিকান সৈনিক এল উইলিয়ামের পাহারায়। সে অত্যন্ত বিরক্ত হাসপাতালে একজন রোগীকে পাহারা দিতে হবে বলে। তখনকার গোর্খা প্রহরীকে সে শুরু থেকেই নিজের অধস্তন মনে করে তাকে হম্বিতম্বি করতে লাগল। কাঠমান্ডু শহরের বিদ্যুতের সমস্যা আগের তুলনায় অনেক কমেছে। উইলিয়াম যে হাসপাতালে আছে সেটা শুধু উচ্চবিত্তদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। কাজেই হাসপাতালের নিজস্ব জেনারেটর আছে, বিদ্যুৎ চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে যায়। সন্ধ্যা আটটার সময় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। পাহাড়ে অসময়ের বৃষ্টি ... বেশিক্ষণ থাকবে না মনে করল সবাই। রাত নটার সময় দেখা গেল বৃষ্টি আরও বাড়ছে এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে বজ্রবিদ্যুৎ। আটটায় যাদের ডিউটি শেষ হয় তাদের অনেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের বদলে নার্স ও কর্মচারীদের অনেকে এসে পৌঁছতে পারেনি। ডাক্তারদের অবশ্য গাড়ি আছে। সাড়ে দশটার সময় সমস্ত এলাকার আলো নিভে গেল। আশ্চর্যজনকভাবে স্বয়ংক্রিয় জেনারেটর চালু হল না। এমারজেন্সি বাতির টিমটিমে আলোয় সবাই ব্যস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে ইলেকট্রিশিয়ানের খোঁজে। দেখা গেল সে বৃষ্টির জন্য আসতে পারেনি।

অপারেশন থিয়েটারে তখন দুটো জরুরী অপারেশন ছিল, তাই সব এমারজেন্সি বাতিগুলো সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। অন্যদিনে যে হাসপাতাল রাত্রে আলো ঝলমল করে আজ বাইরে থেকে বিশাল এক অন্ধকার ভুতুড়ে বাড়ি মনে হচ্ছে ... কোথাও কোন আলোর চিহ্ন নেই ... মাঝে মাঝে যখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তখন বাড়িটার অবয়বের একটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। মার্কিন সৈনিকটি মাঝে মাঝে তার মোবাইলের টর্চটা জ্বালাচ্ছে আর সশব্দে কদর্য ভাষায় নেপালকে গালাগাল করে যাচ্ছে। তার মতে, বহু পাপ করলে মানুষকে এরকম পান্ডববর্জিত জায়গায় চাকরি করতে আসতে হয়। আলো নিভে যাওয়া থেকে উইলিয়াম আতঙ্কে আছে। ঝড়বৃষ্টি, বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, জেনারেটর নিজে থেকে চালু না হওয়া ... এগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা কাকতালীয় ভাবতে পারছে না সে। তার বিছানার ওপর বসে সে ক্রমাগত লামার শেখানো মন্ত্র বলে যাচ্ছে মনে মনে। অনেকক্ষণ পর, তার বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল ... হঠাৎ এক অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে সজাগ হয়ে উঠল। কোথাও কোন শব্দ নেই ... বৃষ্টি থেমে গেছে ... চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ... বাইরে প্রহরীদেরও কোন সাড়াশব্দ নেই। সবাই কি তবে ঘুমিয়ে পড়ল? জানালার দিকে তাকিয়ে একফোঁটা আলোর চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না। এ কি করে সম্ভব? পাঁচতলার ঘরের জানলা দিয়ে শহরের আলো দেখা যায় রাত্রে। বিদ্যুৎ না থাকলেও এরকম অমাবস্যার আকাশের মতো অন্ধকার কীভাবে সম্ভব? এ যেন তার কামরাটাকে কোন জাদুবলে এক ঘোর অন্ধকারের মোড়কে ঢেকে দেয়া হয়েছে। ঠিক এই সময় তার দরজার বাইরে একটা তীব্র আতঙ্কের চিৎকার শোনা গেল ... তার পর স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রর গুলির আওয়াজ ... এক অমানুষিক গর্জন, সেই সঙ্গে কারোর মৃত্যুযন্ত্রণার কাতর আর্তনাদ ... এই সময় প্রবল ধাক্কায় দরজা খুলে গোর্খা প্রহরী ঘরে ঢুকে মাটিতে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে ... খোলা দরজার বাইরে ও কার বিভৎস মুখ? ওম মনিপদ্মে হুম জপ করতে করতে জ্ঞান হারাল উইলিয়াম।

উইলিয়ামের যখন জ্ঞান ফিরল তখন দিনের আলো ফুটেছে। তার ঘরে দুজন ডাক্তার, নার্স, আমেরিকান দূতাবাসের একজন পদস্থ কর্মকর্তা, সুরক্ষা বিভাগের প্রধান এবং কাঠমান্ডুর সর্বোচ্চ পুলিশ অধিকর্তা। সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। জ্ঞান ফেরার পর ডাক্তাররা তার রক্তচাপ ইত্যাদি পরীক্ষা করে রায় দিলেন 'উইলিয়াম মোটামুটি সুস্থ আছে'। সুরক্ষা প্রধান জানতে চাইলেন সে কী দেখেছে। উইলিয়ামের মুখে তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনে সে আর আগের মতো হেসে উড়িয়ে দিল না, কারণ একটু আগেই সে হাসপাতালের মর্গে হতভাগ্য আমেরিকান সৈন্যটির ছিন্নবিচ্ছিন্ন মৃতদেহ দেখে এসেছে। সাতাশ বছর বয়সের এক তাজা তরুণের এরকম ভয়ঙ্কর মৃত্যু তার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। যুদ্ধে প্রাণ গেলে তার হয়ত মনের অবস্থা এরকম হত না। কিন্তু কে বা কারা সৈনিকটিকে এভাবে হত্যা করেছে সেটা নিয়ে ধোঁয়াশা তাকে আরও বিভ্রান্ত করছে। ছেলেটির মাথা প্রায় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন, পেট ছিঁড়ে অন্ত্র বাইরে বেরিয়ে এসেছে, বুলেটপ্রুফ কেভলারের জ্যাকেট এমনভাবে ছেঁড়া যেন কোন শিশু খেলাচ্ছলে কাগজ ছিঁড়েছে। গোর্খা সৈনিকটিও মারাত্মক আহত, তার এখনও জ্ঞান ফেরেনি।

উইলিয়াম যে বিভৎস চেহারা বর্ণনা দিচ্ছে তা কোন হলিউডের সায়েন্স ফিকশন ছবির মধ্যেই দেখা যায়, বাস্তবে না। হয়তো আলো আঁধারিতে মুখোশ পরে তাকে কেউ ভয় দেখিয়েছে, শরীর-মন দুর্বল থাকার জন্য সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিন্তু কোন মানুষের পক্ষে কি একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সশস্ত্র সৈনিকের এই দশা করা সম্ভব? সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে যতগুলো গুলি বেরিয়েছে সবই দেওয়ালে লেগেছে। মানুষ বা জন্তু যাই ওদের আক্রমণ করে থাকুক না কেন, তাদের গায়ে গুলি লাগার কোন চিহ্ন নেই। উইলিয়ামের দৃঢ় বিশ্বাস লামার মন্ত্র লেখা কাপড়, মন্ত্রপূত জলের ছিটে এবং অবিরত মন্ত্র জপ করার জন্য সে কাল রাত্রে প্রাণে বেঁচে গেছে। ঐ ভয়ংকর ডেমন গন্ডি পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে পারেনি। দূতাবাসের পদস্থ কর্মকর্তা নিজে অত্যন্ত বিচলিত হলেও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন। উইলিয়ামকে নিয়ে যাওয়া হল দূতাবাসে সশস্ত্র প্রহরায়। আজকেই তাকে নিউইয়র্ক গামী ফ্লাইটে উঠিয়ে দেওয়া হবে। এই কর্মকর্তাটির পরিচয় কালচারাল অ্যাটাশে হলেও সে আসলে গুপ্তচর বিভাগের লোক। বহু মৃত্যু সেও দেখেছে, কিন্তু আজকের অভিজ্ঞতার জন্য সেও প্রস্তুত ছিল না। গ্রিজলি প্রজাতির ভাল্লুকের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন মানুষের মৃতদেহ সে দেখেছে, কিন্তু জনবহুল কাঠমান্ডু

শহরের কেন্দ্রস্থলে, এক আধুনিক হাসপাতালের মধ্যে কোন জন্তুর আসা তো অসম্ভব ব্যাপার। সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে। গুলির আওয়াজ, মরণাপন্নের আর্তনাদ, কোন অজানা প্রাণীর গর্জন শুনে অন্য তলা থেকে লোকজন ছুটে এসে দেখে চারিদিকে রক্তের দাগ, তার মধ্যে মৃত আমেরিকান সৈনিকটি একটা মাংসপিন্ডের মতো পড়ে আছে, উইলিয়ামের ঘরের মেঝেতে গোর্খা প্রহরীর রক্তাক্ত অচেতন শরীর, আর বেডের উপর উইলিয়াম। সেও অচৈতন্য কিন্তু অক্ষত। করিডোরের দেওয়ালে গুলির দাগ, মেঝেতে খালি কার্তুজ ... কিন্তু আর কিছু নেই। দূতাবাসের কর্মকর্তারা কি রিপোর্ট দেবে তাদের উপরওয়ালাদের সেটাও বুঝতে পারছে না।



যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় দুশ বছর আগের কথা। ফ্রিজিয়া বা ব্রিগো দেশের রাজধানী গর্দিয়নের এক সাধারণ বাড়িতে দুজন মানুষ আলোচনা করছিল। একজন মধ্যবয়স্ক, কাঁচাপাকা চুল ও দাড়ি, নাতিদীর্ঘ কিন্তু বলিষ্ঠ শরীর। অন্যজন বয়সে তরুণ, প্রথমজনের তুলনায় গৌরবর্ণ, মুখচোখের গড়নে, হাঁটাচলা, কথা বলায় আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। প্রথমজনের নাম মিত্তা, তিনি এই রাজ্যের প্রধান পুরোহিত। দৃঢ়চিত্ত চিরকুমার, কুবেলির প্রধান ভক্তদের মতো তিনি যুবক বয়সেই নিজের অন্ডকোষ নিজে হাতে কেটে ফেলে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ওদিশ। ব্রিগো দেশের প্রবাদপ্রতিম রাজা মিদাস তার পূর্বপুরুষ বলে সে দাবি করে। সেকথা সত্য হোক বা না হোক গর্দিয়নের বর্তমান ব্রিগো শাসনকর্তার দ্বিতীয় পুত্র হিসেবে কুলগৌরব সে দাবি করতেই পারে। ওদিশ আজ উত্তেজিত। তার বক্তব্য সব ব্রিগো দেশীয়দের একজোট হওয়া উচিত এবং দেশ থেকে তাদের বর্তমান প্রভু সেলুসিডদের বিতাড়িত করে ব্রিগো দেশের আগের গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া সবার পবিত্র কর্তব্য।

মিত্তা অত্যন্ত ধীর স্থির, গলার স্বর একটু তীক্ষ্ণ, মেয়েলি ধরনের। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন ... "ওদিশ, তুমি যা ভাবছ তা অবাস্তব। রাজা মিদাস'এর পর কত শতাব্দী কেটে গেছে। পর পর বহির্শত্রুর আক্রমণে

ব্রিগোরা শুধু হীনবলই নয় তাদের একতাও নেই, মনোবলও একদম তলানিতে। প্রথমে সিমেরিয়েরা তারপর একে একে পার্থিয়া, মাকিদনিয়া আর এখন এই সেলুসিড গ্রিকরা একসময়ের বিশাল পরাক্রান্ত ব্রিগো রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আজ সমগ্র দেশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। আমরা এখন সেলুসিডদের অধীনে এক করদ রাজ্য। মাতা কুবেলির কৃপায় আমাদের অন্তত দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়নি। আমাদের পূর্বপুরুষদের ভিটে এই গর্দিয়ন শহরে মাতা কুবেলির চরণে আশ্রয়টা তো ছাড়তে হয়নি।"

-"শ্রদ্ধেয় মিত্তা, আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। মাকিদনিয়া তো ছোট্ট এক রাজ্য ছিল, কিন্তু সেখান থেকে আলেকজান্দর তো বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। সেলুকাস নিকাটর যে সেলুসিড রাজ্য গড়ল সে তো আলেকজান্দরের দয়ায়। আমরা কেন আমাদের পূর্বগৌরব ফিরে পাবার চেষ্টা করব না? কে বলতে পারে ব্রিগো দেশ বৈভবে, গৌরবে মাকিদনিয়াকে ছাড়িয়ে যাবে না একদিন?"

— "ওদিশ, তোমার উদ্দেশ্য সাধু তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই টুকরো টুকরো ব্রিগো রাজ্যগুলোকে একজোট কী করে করবে? অনেক রাজ্যের প্রধান ব্রিগোদেশীয় নয়, গ্রীক। তোমার কথা শুনবে কেন সাধারণ লোক? অনেক যুদ্ধ, অশান্তি, রক্তক্ষয়ের পরে এখন শান্তির সময়। সেলুসিডরা পার্থিয়দের মতো নয়, ব্রিগোদের সঙ্গে তারা দুর্ব্যবহার করে না। ব্রিগোরা কি তাদের সেলুসিড প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে রাজি হবে?"

— "শ্রদ্ধেয় মিত্তা, আপনি মাতা কুবেলির প্রধান পুরোহিত। আপনি যদি সঙ্গে থাকেন তাহলে সব সম্ভব। আপনাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। আপনি যদি আমার সঙ্গে থাকেন আমি অন্য রাজ্যের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করতে পারি। আমার দৃঢ় ধারণা, যুক্তি দিয়ে বোঝালে তারা আমাদের সমর্থন করবে।"

— "ওদিশ, তোমার ধারণা ভুল। ব্রিগো দেশের আগের একতা আর নেই। এমনকি বহু রাজ্যে মাতা কুবেলির জায়গায় গ্রিক দেবদেবীর পুজো হচ্ছে। জিউস এখন তাদের পুজ্য দেবতা। আবার পূর্বদিকে অনেকে পার্থিয়দের মতো অগ্নি উপাসক হয়ে গেছে। তারা আহুরা মাজদা'কে মনে করে তাদের প্রধান দেবতা। এক সামান্য পূজারীর কথা তারা শুনবে না।"

— "মানবে মানবে, পূজ্য মিত্তা, যদি আপনি তাদের আপনার অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন।"

— "কিন্তু আমার তো কোনও অলৌকিক শক্তি নেই বৎস ওদিশ।"

— "আপনি মাতা কুবেলির প্রধান পুরোহিত। অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করা আপনার জন্য কিছু কঠিন নয়। আমি শুনেছি রাজা মিদাসের সময় এক পূজারি ছিলেন যিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারতেন, নিজের ইচ্ছায় বৃষ্টি নামাতে পারতেন। আপনিও পারবেন। আমি শুনেছি সেলুসিড রাজ্যের পূর্বদিকে যে হিন্দ দেশ আছে তারও উত্তর পূর্বে এক দেশ আছে সেখানে 'বন' বলে এক সুপ্রাচীন ধর্মের উপাসকরা থাকে। তারা প্রেত, পিশাচ সিদ্ধ। অসীম শক্তিধর এই পূজারিরা। আমরা যদি সেখানে যাই, তাদের কাছে এই গুপ্তবিদ্যা আমরা শিখতে পারি। তাহলে আমরা অপরাজেয় হয়ে যাব।"

"ওদিশ, এই বন ধর্মের কথা আমিও শুনেছি। কিন্তু এতে তো অনেক অমঙ্গল আসতে পারে। এ শক্তি ভয়ংকর ... এই সব অপশক্তি সর্বনাশ ডেকে আনে ... এতে কি ব্রিগোদের ভালো হবে?"

—"শ্রদ্ধেয় মিত্তা, আপনার মতো বিজ্ঞ মানুষ এরকম কথা বলছেন? শক্তি ছাড়া কি শাসন করা যায়? আমাদের পূর্বপুরুষরা যে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করেছে, সে তো যুদ্ধ করে, হত্যা করে, ধ্বংস করে। কিন্তু তার থেকে দেশের সামগ্রিক মঙ্গল তো হয়েছে।"



এমিরেটের প্লেন কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিমানবন্দর থেকে আকাশে ওড়ার পর উইলিয়াম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। আর কোন বিপদ নেই। জীবনে আর সে এসব অলৌকিক শক্তির খোঁজে ছুটে বেড়াবে না। বাড়ি ফিরে বাবার ব্যবসায় যোগ দেবে নয়তো কোনো চাকরি করবে। ভবঘুরে জীবন এই শেষ। সিট বেল্ট সাইন নিভে যাবার একটু পরে পানীয়ের ট্রলি নিয়ে এল বিমান সেবিকারা। গত দিনগুলোর ঘটনা এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। তবুও লামার দেওয়া মন্ত্র লেখা কাপড়টা সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে। তার নতুন কেনা ব্যাকপ্যাকেই আছে সেটি।

এক ক্যান বিয়ার নিল উইলিয়াম। বিমান সেবিকা মিষ্টি হেসে ছোট এক

প্যাকেট বাদামও দিল। বলল "আপনি কি আপনার ব্যাকপ্যাকটা ওভারহেড ব্যাগেজ স্পেসে রাখতে চান? তাহলে আরও ভালোভাবে বসতে পারবেন।"

ব্যাগটা সিটের নিচ থেকে মেয়েটির হাতে দিয়ে দিল উইলিয়াম। সে তার মাথার ওপরেই লাগেজ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিল সেটা। পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে বিয়ার পান করতে করতে একটা সিনেমা দেখতে লাগল সে। তিন ক্যান শেষ করার পর উইলিয়ামের একটু টয়লেটে যাবার দরকার হল। প্লেন তখন ভারতের আকাশ দিয়ে উড়ছে।

টয়লেটের ভিতরে ঢুকে দরজা লক করতেই আলো জ্বলে উঠল। ঠিক সেই সময় এক কোণ থেকে চকচকে কালো চাবুকের মতো মৃত্যুদূত ফনা তুলল তার অলক্ষ্যে। ছোবলটা পড়ল তার বাঁ হাতে। অনেকক্ষণ টয়লেটের দরজা বন্ধ থাকায় সন্দেহ হতে দরজার লক ভেঙে উইলিয়ামের ঠান্ডা হয়ে যাওয়া মৃতদেহটা আবিষ্কার হয়। টয়লেটের মধ্যে আর কিছু কারোর নজরে আসেনি। দিল্লিতে বিমান নামানো হল, সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণে উইলিয়ামের শরীর শক্ত হতে শুরু করেছে। ডাক্তাররা অনুমান করলেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু ঘটেছে।



ওদিশ ও প্রাজ্ঞ মিত্তার যাত্রা খুব সহজ হল না। মিত্তা অনেক আপত্তি করেছিলেন, দুর্গম যাত্রা পথ, বিপদের ভয় তো আছেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ লেগেই আছে। এইরকম অবস্থায় এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হবে তা বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু ওদিশ নাছোড়বান্দা। সে নিজে তো যাবেই, প্রধান পুরোহিত মিত্তাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

অগত্যা মাতা কুবেলির পুজো দিয়ে সাশ্রুনয়নে দেবীর কাছে অনুমতি চাইলেন মিত্তা ... "হে জগন্মাতা, তোমার কৃপায় যেন মানুষের মঙ্গল দায়ক কিছু বিদ্যা নিয়ে ফিরে আসতে পারি তোমার চরণে"। পনেরো জন সাহসী দেহরক্ষী, আটজন ভৃত্য ও ওঁরা দুজন এক শুভদিন দেখে অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করলেন। এক দূর দেশের উদ্দেশ্যে যার অদ্ভুত নাম ওঁরা লোকমুখে শুনেছেন — ঝাংঝুং নাকি ৎসাং ৎসুং। ওদিশ আর মিত্তার সঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে প্রচুর

হাসাহাসি করছে এই উদ্ভট নাম নিয়ে। না, অজানা পথের ভয় তাদের নেই। ওদিশ বেছে বেছে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়েছে দেহরক্ষী হিসেবে। তবে এরা কেউ যোদ্ধাবেশে নেই। বণিকের ছদ্মবেশেই এই অশান্ত সময়ে ভিনদেশে যাবার জন্য উপযুক্ত। সেলুসিড রাজত্বের মধ্যে যতদিন থাকা যায় ততদিন বিশেষ চিন্তা নেই। কিন্তু পূর্বদিকে ব্যাকট্রিয়া রাজ্যের সীমান্ত পার হওয়ার সময় সমস্যা হবে। কারণ দুই রাজ্যই গ্রিক হলেও সদ্ভাব নেই বিন্দুমাত্র তাদের মধ্যে। কিন্তু ব্যাকট্রিয়ার পূর্ব সীমান্ত পার হয়ে তবেই সেই অদ্ভুত নামের দেশে যেতে হবে। ব্যাকট্রিয়ার সৈন্যরা যদি জানতে পারে তারা সেলুসিডদের এক করদ রাজ্য থেকে এসেছে, তাদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবে বলা কঠিন। একটাই সুবিধা তারা দুজনে এবং দেহরক্ষীদের সবাই গ্রিক ভাষায় কথা বলতে পারে। ব্যাকট্রিয়া সীমান্ত পার হবার আগে ওরা ঠিক করল নিজেদের গ্রিক ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেবে, সুদূর এথেন্স থেকে আসছে তারা। মিত্তার নাম হবে মিদাস আর ওদিশ হবে ওডিসিউস।

সীমান্ত পার হতে অসুবিধা বিশেষ হয়নি, কারণ তারা অপেক্ষাকৃত দুর্গম জায়গা বেছে নেয় ব্যাকট্রিয়া দেশে ঢুকতে। প্রায় আট মাস পর এরা ঝাংঝুং নামক দেশের পশ্চিম সীমান্তে এসে পৌঁছয়। পথে দুজন দেহরক্ষী এবং একজন ভৃত্য প্রাণ হারায় দুর্ঘটনায় ও অসুস্থতার কারণে। এই দেশ বেশ ঠান্ডা এবং শুষ্ক। উচ্চতার জন্য সবার বেশ শ্বাসকষ্ট হয়েছে প্রথম দিকে। তারপর অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝেছে এখানে দ্রুতগতিতে কিছু করলে অসুবিধা হবে, ধীরে সুস্থে সব কিছু করতে হবে। এই দেশে সবুজের চিহ্ন কম, রুক্ষ পাথরের সুউচ্চ পর্বতমালা ঘিরে রেখেছে এই দেশের পশ্চিম সীমান্তে এই অঞ্চলকে। সমস্যা দেখা দিল ভাষা নিয়ে। যতদিন তারা ব্যাকট্রিয়া দেশের ভিতর দিয়ে আসছিল ভাষা নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। গান্ধার দেশেও অনেক গ্রিক ভাষাভাষী মানুষ পেয়েছে তারা। এই দেশের মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলে তা দুর্বোধ্য, তাদের দেখতেও অন্যরকম। ছোট ছোট সরু চোখ, চাপা নাক ... এরকম মানুষ এরা আগে কখনও দেখেনি। সৌভাগ্যবশত এখানে আর এক জাতির মানুষ থাকে, তারা নিজেদের 'দারদিয়' বলে। তারা গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি এবং সুপুরুষ। তাদের ভাষা কিছুটা বোধগম্য। এরা এক অজানা ধর্মাবলম্বী। এদের দেবতাদের নাম ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র ইত্যাদি। দারদিয়দের একজনকে

নেওয়া হল দোভাষী হিসাবে। লোকটি বুদ্ধিমান, বেশ কয়েকটি ভাষা জানে এবং সবচেয়ে বড় কথা ... বহু দেশ ঘোরার জন্য পথঘাট তার জানা। এবার খুঁজে বার করতে হবে সেই পিশাচ সিদ্ধ বন ধর্মের উপাসকদের।



টম ম্যাকান আর জেরেমি উডওয়ার্ডকে বৌদ্ধ বিহারে হানা দেবার জন্য গুন্ডা বাহিনী একত্র করতে বেগ পেতে হল। নেপালিরা সাধারণত ধার্মিক স্বভাবের হয়, দেব দেবী, ভূত প্রেতে যথেষ্ট বিশ্বাস তাদের। কোন ধর্মীয় স্থানে উৎপাত করতে দাগী অপরাধীদেরও দ্বিধা বোধ হয়। খুঁজে পেতে ওরা তিন জন মদেশিয়া লোক পেল। এরা নেপালের তরাই এর লোক, আসলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত, বহুকাল ধরে নেপালের বাসিন্দা হওয়ার সূত্রে নেপালি নাগরিক হয়ে গেছে। এদের যোগাড় করতে সাহায্য করল ওদের ড্রাইভার, যে মনীশকে অপহরণ করার সময় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এই তিনজন ছাড়া আরও দুজন নেপালি পাওয়া গেল, যারা প্রাক্তন মাওবাদী। তাদের নেতা 'প্রচন্ড' মূলধারার রাজনীতিতে চলে আসার পর রোজগার বন্ধ হয়ে যেতে তারা অপরাধ জগতে চলে এসেছে। মাওবাদী সন্ত্রাসের সময় তাদের কাছে এসেছিল চিনা আগ্নেয়াস্ত্র। সেসব এখন ডাকাতি আর ছিনতাইয়ের কাজে লাগছে।

টম ঠিক করল, এই পাঁচ জন মনাস্টারির মধ্যে ঢুকবে সাধারণ মানুষের মতো, গ্রাম্য পোষাক পরে। ভিতরে গিয়ে যখন সান্ধ্য প্রার্থনা শুরু হবে তখন ওরা প্রধান লামাকে বন্দি করবে। তার গলায় কুকরি ধরে বাকি সবাইকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দেবে। তখন টম ঢুকবে এবং লামাকে বাধ্য করবে পুঁথিটা ওদের হাতে দিতে। জেরেমি আর ওদের ড্রাইভার বাইরে অপেক্ষা করবে গাড়িতে। কার্যসিদ্ধ হলেই টম বাইরে এসে গাড়িতে বসবে। বাকি পাঁচজনের আছে তিনটে মোটরবাইক, একটু দূরে রাখা।

ওরা যেমন প্ল্যান করেছিল, কাজের সময় দেখা গেল আশাতীতভাবে সহজে হয়ে গেল সব কিছু। এই পাঁচ জন স্থানীয় লোক হওয়ায় কারোর সন্দেহ হয়নি ওদের দেখে। লামার গলায় যখন একজন ভোজালি ধরল তখন অন্যরাও তাদের অস্ত্র বার করে। সন্তস্ত্র ছাত্র এবং অন্য ভিক্ষুরা প্রধান লামার

নিরাপত্তার জন্য একটি শব্দ না করে এদের নির্দেশ পালন করল। লামা খুব শান্ত ছিলেন। টম এসে যখন পুঁথিটা চাইল লামা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে এই পুঁথি অত্যন্ত বিপজ্জনক। এটি সঙ্গে থাকলে তাদের মহা বিপদ হতে পারে। উইলিয়ামের হাসপাতালের ঘটনা তিনি শুনেছিলেন, সে কথা টমকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। টম অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করল না কিন্তু ধরে নিল আরও একটি দল এই পুঁথিটা হাতে পাওয়ার চেষ্টা করছে এবং সম্ভবত তারা বেপরোয়া ও হিংস্র।

এদের চাপে গুপ্ত জায়গা থেকে পুঁথিটা বার করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও টমের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন প্রধান লামা। তথাগতর পূজারি তিনি, মনে দৃঢ় বিশ্বাস তথাগত কোন অন্যায় হতে দেবেন না। পুঁথির আসল মালিক ওই কলকাতাবাসী বাঙালি বাবুর কাছে তিনি এটি পাঠিয়ে দিতে পারবেন। টম লামাকে বেঁধে রেখে যেতে চাইলেও অন্যরা রাজি হল না। এমনকি যাবার আগে একজন মাওবাদী বিড়বিড় করে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে গেল।

টম ম্যাকান ও তার দলবল মনাস্টারির দরজার বাইরে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র তিনি প্রথমে তাঁর ছাত্র ও ভিক্ষুদের মুক্ত করলেন বন্দিদশা থেকে। তাদের কয়েকজনকে বললেন আড়ালে থেকে বাইরের দিকে নজর রাখতে। বাকিদের বললেন প্রার্থনায় বসতে। তিনি নিজে মূল প্রার্থনাকক্ষের পাশে একটি ছোট ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে। মোমের মৃদু আলোয় দেখা গেল এক ভয়ালদর্শন দেবীমূর্তি, বজ্রযানি বৌদ্ধ ধর্মের দেবদেবীর মধ্য মহাশক্তিধর দেবী একজটা। রক্তচক্ষু, নীলবর্ণা, পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, গলায় দীর্ঘ নরমুণ্ডমালা ... দেবীর চার হাতের একটিতে অসি, একটিতে খঞ্জর, একটিতে কপাল এবং অন্যটিতে একটি নীল পদ্ম। দেবীর আরাধনায় সমস্ত বিঘ্ন দূর হয় শত্রুর বিনাশ হয় এমনটাই বিশ্বাস বজ্রযানি বৌদ্ধদের। কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেবীর সামনে ধ্যানে বসলেন প্রধান লামা। একজটা দেবীর উপাসনার গুহ্য মন্ত্র ও পদ্ধতি শুধু তিনিই জানেন।

একটু দূর থেকে আরও দুজন মনাস্টারির ওপর নজর রাখছিল। তাদের পোশাক দেখে মুস্তাং অঞ্চলের মানুষ বলেই মনে হয়। কাঠমান্ডুতে সেরকম ঠান্ডা না থাকা সত্ত্বেও তাদের পোশাকের ওপর একটা আলখাল্লা পরা। সেটা হয়তো তাদের কোমরের ধারালো কুকরি লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্য

হতে পারে। টমের দলের পাঁচজন যখন স্থানীয় ভক্তদের মত মনাস্টারিতে ঢোকে, ওরা সেটা অস্বাভাবিক মনে না করলেও, টম যখন ঢোকে তখন সেটা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ওরা নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলছিল না। কিন্তু যেন ওদের কেউ চালনা করছিল। টম ভিতরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একজন মনাস্টারির কাছে এসে একটা ভাঙা পাঁচিলের পাশে লুকিয়ে পড়ল। অপরজন হাঁটা দিল ওদের গাড়ির দিকে। গাড়ি রাখা ছিল কিছুটা দূরে, যাতে কারোর কোন সন্দেহ না হয়। এই লোকটা গাড়ির কাছাকাছি এসে রাস্তার পাশে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল। জেরেমি আর ওদের ড্রাইভার লোকটাকে একবার দেখে অস্বাভাবিক কিছু মনে না হওয়ায় তাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল মনাস্টারির দরজার দিকে।

মনাস্টারির বাইরে এসে টম মদেশিয়া তিনজনকে চুক্তি অনুযায়ী টাকাপয়সা দিয়ে বিদায় করে দিল। মাওবাদী দুজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলে তাদের বলল দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে, লামা বা তার লোকজন যদি পিছু নেবার চেষ্টা করে তারা ভয় দেখিয়ে তাদের আটকাবে। কিছুটা অনিচ্ছাকৃতসত্ত্বেও তারা টাকার লোভে রাজি হল। তাদের সঙ্গে মদেশিয়াদের থেকে বেশি টাকার চুক্তি হয়েছে। টম যখন ধীরে সুস্থ গাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে তখন প্রথম মুস্তাংবাসী লোকটা পাঁচিলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। কিছুটা দূরত্ব রেখে টমের পিছু নিল সে। মাওবাদী দুজনের নজর মনাস্টারির দিকে থাকার জন্য তারা লক্ষ্য করল না। টম যখন গাড়ির কাছাকাছি তখন দ্বিতীয় লোকটা উঠে দাঁড়াল এবং প্রথম লোকটা তার গতি বাড়িয়ে দিল, দুজনেরই হাতে উঠে এসেছে উন্মুক্ত কুকরি, সন্ধ্যার আধা অন্ধকারেও সেগুলোর ধাতব ঝলক চোখে পড়ছে।

টমের আগেই এদের দেখতে পেল জেরেমি। টমকে একটা চিৎকার দিয়ে সাবধান করে ও কাছের লোকটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল তার রিভলবার থেকে। লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েও আবার ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। গুলির আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে মাওবাদী দুজন তাকিয়ে দেখে প্রথম লোকটা ততক্ষণে টমের কাছে পৌঁছে গেছে, তার উদ্যত কুকরি সবেগে নেমে এল টমের কাঁধ লক্ষ্য করে। টম একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। জেরেমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে গুলি করল প্রথম লোকটাকে, কিন্তু সে

ইতিমধ্যেই টমকে আর একবার আঘাত করেছে এবং হাত থেকে পুঁথিটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। টম মারাত্মক জখম হওয়া সত্ত্বেও তার রিভলবার বার করে প্রথম লোকটাকে গুলি করতে সে পড়ে যায়। ততক্ষণে জেরেমি ও দুজন মাওবাদী তার কাছে পৌঁছে গেছে। একজন তার মোবাইলের টর্চ জ্বালতে দেখা গেল টম গুরুতর আহত, প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে তার ক্ষতগুলি দিয়ে। টর্চের আলো আততায়ীর দিকে ফেলতে এরা চমকে গেল ... দুজনেই গুলি লাগার পর উঠে বসেছে ... কিন্তু সবচেয়ে ভয়ানক তাদের মুখ। জীবিত মানুষের মুখ কি এরকম হয়? ফ্যাকাশে রক্তশূন্য ভাবলেশহীন মৃত মানুষের মতো মুখ। জেরেমি চমকে গিয়ে বলল ... "my God, are they zombies?" দুজনের ওপরই উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ করল ওরা। ততক্ষণে মনাস্টারির ভিক্ষুরা বেরিয়ে এসেছে ... রক্তাক্ত শরীরে প্রায় অচৈতন্য টমকে দেখে ওরা চাইল তাকে মনাস্টারির ভিতরে নিয়ে যেতে ... তার এখনই রক্তপাত বন্ধ হওয়া দরকার। জেরেমি ইতস্তত করলেও নেপালি ড্রাইভার তাকে বোঝাল হাসপাতালে যাওয়া তাদের জন্য বিপজ্জনক। মনাস্টারির সাহায্য নেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। ধরাধরি করে টমকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। কিছু লতাগুল্ম বেটে তাই দিয়ে তার ক্ষতগুলি বেঁধে দিতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হল। তবে ততক্ষণে টম জ্ঞান হারিয়েছে। মাওবাদী দুজন ওখানে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াল না, আততায়ী দুজনের মুখ দেখে মারাত্মক ভয় পেয়েছে তারা। টাকাপয়সা না নিয়েই তারা পালিয়ে গেল। যাবার সময় দেখল দুজন আততায়ীর কোন চিহ্ন নেই। অতগুলো গুলির আঘাত সত্ত্বেও তারা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ভগবানের নাম জপতে জপতে প্রাণভয়ে দৌড় দিল দুই প্রাক্তন মাওবাদী।

টম আর জেরেমির কাছে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, যা ওদের এতদিনের ধারণা, জীবনদর্শন সব ওলটপালট করে দিয়েছে। যাদের ঘরে ডাকাতি করতে এসেছিল তারাই এখন সেবা যত্নে টমকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনছে। অত্যাধিক রক্তক্ষরণের জন্য টমের প্রাণসংশয় হয়েছিল। লামা নানারকম জড়িবুটি দিয়ে চিকিৎসা করে তাকে অনেকটা সুস্থ করে তুলেছেন। অন্য ভিক্ষুকরাও তার খুবই যত্ন করছে। তবে টম এখনও বেশ দুর্বল। কাঠমান্ডুর কোন হাসপাতালে ভর্তি হবার সাহস তাদের ছিল না। কারণ এইরকম ক্ষত

নিয়ে হাসপাতালে গেলে থানা পুলিশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। যেটা ওদের দুজনকে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত করছে সেটা লামার ব্যবহার। লামা ওর এত যত্ন করছে কেন সেটা ওরা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। ওরা এমন এক সমাজ থেকে এসেছে যেখানে বিনা মূল্যে বা বিনা স্বার্থে কেউ কারোর জন্য কিছু করে না। অথচ এরা ওদের শত্রু না ভেবে আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করছে। কি ধরনের মানুষ এরা?

টম আর জেরেমি মনাস্টারির দোতলায় একটা ঘরেই থাকে। গাড়িটা মনাস্টারির পিছনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ ড্রাইভার খবর এনেছে পুলিশ গাড়িটা খুঁজছে। ওদের দুজনকেও খুঁজছে মনীশের অপহরণকারী হিসেবে। যেদিন ওরা এই বৌদ্ধবিহারে হানা দেয়, সেদিন ওদের পুঁথিটা নিয়ে কাঠমান্ডু থেকে পালিয়ে যাবার কথা। এই গাড়িটা নিয়ে ওরা চলে যেত বীরগঞ্জ। বর্ডার পার হলেই ইন্ডিয়া ... মুক্তি।

কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল ঐ দুজন অদ্ভুত লোকের জন্য। আচ্ছা ওরা কি মানুষ। তাহলে এতগুলো গুলি লাগার পর কী করে বেঁচে থাকে, চলেই বা যায় কী করে? কারা ওদের পাঠিয়েছিল? লামাকে প্রশ্ন করেছিল টম। তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যা বললেন তার মানে "ওরা মানুষ ছিল না সম্ভবত ওরা ছিল 'তুল্পা'।" কিছু মাথায় ঢোকেনি ওদের। তবে কি জেরেমির কথাই ঠিক ... ওরা জোম্বি?

পুঁথিটা ওরা লামাকে ফেরত দিয়েছে। ভাবছে ওঁর কাছে ক্ষমা চাইবে। ওদের ড্রাইভার প্রথম দিনেই ক্ষমা চেয়েছে, লামা শুধু একটু হেসেছেন। তিনি পুলিশে খবর দেননি।

মনাস্টারিতে প্রার্থনা এখন অবিরাম চলছে। একদল থামে, আর একদল ধরে। তার সঙ্গে চলছে ধর্মচক্রের আবর্তন। লামা জানেন পুঁথিটা উদ্ধার কারা করতে চাইছে, তাদের কি অপরিসীম শক্তি।

কলকাতা থেকে ফোনে ইন্সপেক্টর প্রধান এবং মনীশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন বিনয়বাবু। শেষ কথোপকথনে ইন্সপেক্টরের কাছে উইলিয়ামের হাসপাতালের ঘটনা শুনে তিনি ভীত হয়ে পড়েছেন। বাড়ি ফেরার পথে উইলিয়ামের মৃত্যুর খবরটাও বিনয়বাবু পেয়েছেন। ইন্সপেক্টর প্রধানের দৃঢ় বিশ্বাস এ সব অপ্রাকৃত ঘটনা। আমেরিকান সৈনিকটির বিভৎস

মৃত্যুর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি পোস্ট মর্টেম করার পরেও। যে ডাক্তার পোস্টমর্টেম করেছেন তিনি নিজে অত্যন্ত বিভ্রান্ত, এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে প্রথম। বিনয়বাবু কালীকিঙ্করের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন এই বিষয় নিয়ে। সব শুনে যে বলল "ভাই, এ জিনিস বাড়িতে আনা ঠিক হবে না। আমি অল্প স্বল্প যেটুকু জানি তন্ত্রেও এ রকম ঘটনা ঘটানো যায়। নিম্নমার্গের তান্ত্রিকরা পিশাচ, হাকিনি, ডাকিনীদের বশীভূত করে মানুষের ক্ষতি করে। ভূতডামরতন্ত্রে এসব আছে। তবে এরা হয়তো আরও শক্তিশালী।"

বিনয়বাবুর ভূত প্রেতে সেরকম বিশ্বাস না থাকলেও সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ তাঁর লৌকিক অলৌকিক নিয়ে ধ্যানধারণা টলিয়ে দিয়েছে। এসবের কিই বা ব্যাখ্যা আছে। এইসব ভয়াবহ ঘটনার সঙ্গে যে পুঁথিটার সম্পর্ক আছে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। এতগুলো ঘটনা তো আর কাকতালীয় হতে পারে না। তিনিও মনে মনে কালীর সঙ্গে একমত হলেন ... পুঁথিটা বাড়িতে আনা ঠিক হবে না। কিন্তু কালীর মাথায় অন্যরকম ভাবনা।

— "দেখ, পুঁথিটা এখানে আনতে হবে না। কিন্তু পুঁথিটা আমি একজনকে দেখাতে চাই। আমার নিজেরও যথেষ্ট আগ্রহ আছে দেখার।

— "কাকে দেখাবি? আর দেখতে গেলে তো আমাদের আবার কাঠমান্ডু যেতে হবে।" কালিকিঙ্কর অম্লান বদনে বলল "হ্যাঁ, তা তো হবেই। তোর তো দেদার পয়সা। খরচা তুই দিবি।" "বিনয়বাবু একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন "ঠিক আছে, সে না হয় দিলাম। কিন্তু তুই আর কাকে নিয়ে যেতে চাস?"

— "তুই তাঁকে চিনিস না। তিনি আমার পরিচিত একজন তন্ত্রসাধক। বহুদিন চর্চা করছেন এই বিদ্যার, বহু দেশ ঘুরেছেন। থাকেন একদম সাধারণ মানুষের মতো। কিন্তু বিশাল জ্ঞান, অনেক ক্ষমতাও আছে তাঁর। এই পুঁথির সঙ্গে যে অশুভ শক্তি আছে তা কাটানোর জন্য ওঁকে নিয়ে যেতে হবে।"

— "তিনি কি যেতে রাজি হবেন?"

— "আমায় খুব স্নেহ করেন, আমি বললে নিশ্চয়ই যাবেন। তাছাড়া পুঁথিটার কথা শুনলে ওনারও আগ্রহ হবে।"

— "ঠিক আছে, তুই ওনার নাম আমায় একটা কাগজে লিখে দে। ওনার পাসপোর্ট আছে তো? নাহলে অবশ্য ভোটার কার্ড হলেও চলবে। তোর

আছে তো ভোটার আই ডি?

"হ্যাঁ আছে বোধহয়, একটু খুঁজে দেখতে হবে। সে হবে এখন। তুই আগে ওনার কাছে চল আমার সঙ্গে। পূর্বাপর ঘটনা তোর কাছে উনি যদি শোনেন তাহলে ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন উনি।"

পরের দিন কালী আর বিনয়বাবু একসঙ্গে সোনারপুর গেলেন সকালের দিকে। হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একটা ছোট দু-কামরার বাড়িতে ভাড়া থাকেন। অবিবাহিত, এক বিধবা দিদি থাকেন সঙ্গে। একসময় স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। রিটায়ার করে পেনশন, আর ছাত্র পড়িয়ে যা রোজগার করেন তাতে ভাইবোনের মোটামুটি চলে যায়।

হরেন্দ্রনাথ সমস্ত ঘটনা শুনলেন চুপচাপ। তারপর বিনয়বাবুকে কিছু প্রশ্ন করলেন। তিনি কি স্বপ্ন দেখেছিলেন, নেপালে কালী মন্দিরে সন্ন্যাসী ঠিক কি বলেছিলেন ইত্যাদি। তারপর একটু চিন্তা করে বললেন "ঠিক আছে, আমি যাবো। কিন্তু আমার খরচা আমি দেবো"। বিনয়বাবু ও কালীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও উনি বিনয়বাবুর খরচায় যেতে রাজি হলেন না। নেপাল ওঁর চেনা জায়গা। পশুপতিনাথ মন্দির, গুহ্যেশ্বরী শক্তিপিঠ বেশ কয়েকবার দর্শন করে এসেছেন। বললেন "এরোপ্লেনে যাওয়া আমার সাধ্যের বাইরে, আমি ট্রেনে রক্সৌল যাব, তারপর বর্ডার পেরিয়ে বীরগঞ্জ পৌঁছে সেখান থেকে বাসে যাব কাঠমান্ডু।" অগত্যা ঠিক হল সেভাবেই যাওয়া হবে। বিনয়বাবুর অনেক অনুরোধে থাকা খাওয়ার খরচা বিনয়বাবু বহন করবেন তাতে হরেন্দ্রনাথ রাজি হলেন।

দোরজে এখন কাঠমান্ডুতে। শহরের উপকণ্ঠে বন ধর্মাবলম্বীদের একটা গুপ্ত আড্ডা আছে। সেখানে তার অনেক শিষ্যের আনাগোনা। দোরজের মতো একজন নামী উপাসককে কাছে পেয়ে তারা খুবই উল্লসিত। দোরজে যা চাইবেন তা ওরা পালন করতে প্রস্তুত। কিন্তু দোরজে তাদের কারো সাহায্য চায়নি। শুধুমাত্র যে সমস্ত গোপন ক্রিয়া উপাচারগুলো করছে দোরজে, তার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো আনিয়ে নিচ্ছে এই সব স্থানীয় ভক্তদের মাধ্যমে। শুধু একজন বিশ্বস্ত ভক্ত মুস্তাং থেকে তার সঙ্গে এসেছে। এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল দুটো ... ঐ বিদেশি সাদা চামড়ার মানুষটা তার সাধনায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে, দুজন শিষ্য মারা গেছে ওর জন্য ... সবচেয়ে বড় কথা দু-হাজার

বছর ধরে যে পবিত্র গ্রন্থ তাদের মনাস্টারির মহামূল্যবান সম্পত্তি, সেই গুপ্তবিদ্যা লেখা গ্রন্থ সে চুরি করে এনেছে ... তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। সে শাস্তি দিতে দোরজে সফল হয়েছে। এখন সেই মহাগ্রন্থ উদ্ধার করতে হবে। সমস্যা হচ্ছে যে মনাস্টারিতে রাখা আছে সেই গ্রন্থ, তার চারদিকে এক শক্তির বলয় আছে। সেই গন্ডি ভেদ করে যাওয়া তার অনুগত অপদেবতাদের কর্ম নয়। মনাস্টারিতে আছে একজটা দেবীর মূর্তি, বজ্রভৈরবের মূর্তি আর পালদেন লাহমো'র থাঙ্কা ঝুলছে চারিদিকে। তাই সুযোগের অপেক্ষায় আছে দোরজে। গ্রন্থ তাকে পেতেই হবে। তার মধ্যেই আছে অসীম শক্তিধর হবার উপায়। এই সাধনায় অনেক দূর এগিয়েছে সে। আরও এগারোজন মানুষের বলি চাই একান্ন বলি সম্পূর্ণ হতে। তখন সে হবে অসীম ক্ষমতার অধিকারী, অপরাজেয়। পবিত্র বন ধর্মকে আবার ফিরিয়ে আনবে সে। ফিরে আসবে প্রাচীন ঝাংঝুং দেশের গৌরব। মুস্তাং অঞ্চলে ট্রেকিং করতে এসে অনেকে হারিয়ে যায়। বাইরের জগত ভাবে দুর্ঘটনা। তাদের বেশিরভাগই দোরজের সাধনায় বলি হয়েছে। তার চল্লিশতম বলি ছিল ঐ বিদেশির বন্ধু। কিন্তু সেদিনের বলি সম্পূর্ণ হয়নি। যে করেই হোক পবিত্র গ্রন্থ উদ্ধার করে তাকে নিজের জায়গায় ফিরতে হবে। আবার পূর্ণোদ্যমে শুরু করতে হবে পিশাচ সিদ্ধ হবার সাধনা।

প্রফেসর দাশগুপ্তও ওদের সঙ্গে নেপাল যেতে চাইলেন। ওনার ইচ্ছে পুঁথিটা একবার নিজের চোখে দেখা। বিনয়বাবু যখন মোটামুটি স্থির করেই ফেলেছেন যে পুঁথিটা নিয়ে আসবেন না, তখন এরকম একটা দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন জিনিস নিজের হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখার ইচ্ছে সম্বরণ করতে পারলেন না তিনি। বিনয়বাবু আর কালিকিঙ্করের মুখে পুঁথিটা নিয়ে যে যে ঘটনা ঘটেছে সব শুনেছেন তিনি। তাঁর যুক্তিবাদী মন বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে এক দোলাচলে আছে। এসব ঘটনার কি কোন ব্যাখ্যা আছে? ট্রেনের থ্রি টিয়ার কামরায় এক জায়গাতেই ওঁদের সিট পড়ল। হরেন্দ্রনাথ ও প্রফেসর দাশগুপ্তর পরিচয় হবার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ওঁরা দুজন গভীর তাত্ত্বিক আলোচনায় মগ্ন, বিনয়বাবু আর কালী নীরব শ্রোতা। আলোচনার বিষয় মাতৃদেবীর আরাধনার প্রাচীনত্ব। প্রফেসর পুঁথির ফোটোকপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। হরেন্দ্রনাথ গভীর আগ্রহ নিয়ে ফোটোকপি করা পৃষ্ঠাগুলো

দেখলেন। প্রফেসর তাঁকে ফ্রিজিয়ান হরফে লেখাগুলোর যে অনুবাদ তিনি নিজে করেছেন তা শোনালেন। প্রাচীন তিব্বতী হরফে মূল লেখার ভালো করে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি, কিছু কিছু হয়েছে। তাও প্রফেসর সঙ্গে করে এনেছেন। ফ্রিজিয়ান হরফে লেখাগুলোর লেখকের নাম পুঁথির একদম শেষের দিকে লেখা আছে, এক 'মিত্তা', যিনি নিজেকে মহাদেবী মাতা কুবেলির প্রধান পুরোহিত বলে পরিচয় দিয়েছেন।

প্রফেসর বললেন "যিশুখৃষ্টের জন্মের অনেক আগে সমগ্র পূর্ব ইউরোপে ও মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু দেবদেবীর পূজা অর্চনা হত। তার মধ্যে সিংহবাহিনী মাতৃদেবীর পূজার অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। সব জায়গায় এই দেবী শুভশক্তির প্রতীক, অশুভ শক্তির নিধনের কামনায় এঁর আরাধনা। এছাড়াও বিজয়, সমৃদ্ধির ও উর্বরতার দেবী হিসেবেই মাতৃদেবীর পূজা। সম্ভবত এই 'মিত্তা' পুঁথির মূল লেখার উদ্দেশ্যে যে শুভ নয় তা বুঝতে পেরে প্রতি পৃষ্ঠার মার্জিনে নিজের ভাষায় অশুভ শক্তির বিনাশের প্রার্থনা লিখে গেছেন।"

হরেন্দ্রনাথ বললেন "পুঁথির মূল লেখার পাঠোদ্ধার করতে পারলে ভালো হত। কিছুটা আন্দাজ পেতাম অশুভ শক্তি কত শক্তিশালী।"

প্রফেসর অবাক হয়ে বললেন "আপনি বলছেন সত্যিই এক মন্ত্র পড়ে অশুভ শক্তি, মানে ভূত প্রেত, অপদেবতাকে ডাকা যায়? তাদের দিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করানো যায়?"

— "ডক্টর দাশগুপ্ত, আপনি পন্ডিত মানুষ। আপনি তো জানেন পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। Demonic Possession এর ঘটনা, যাকে আমরা বলি প্রেতাত্মার ভর হওয়া, পৃথিবীর অনেক দেশেই শোনা গেছে।"

— "তার তো একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গ্রামে যেসব ভর হওয়ার ঘটনা শোনা যায়, সে তো আগের দিনে যাকে হিস্টিরিয়া বলা হত ... অবদমিত ইচ্ছা, সাংসারিক অশান্তির জন্য অস্বাভাবিক ব্যবহার। যার জন্য বেশিরভাগ ভর হওয়ার ঘটনা মেয়েদের হয়।"

— "আপনি ঠিকই বলছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভর হওয়ার ঘটনাগুলোর এই ব্যাখ্যাই ঠিক। কিন্তু কিছু ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া

সম্ভব নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯০৬ সালে ক্লারা জারমানা নামে একটি ষোল বছরের কিশোরীর যখন ভর হত তখন সে চারটি ভাষায় কথা বলতে পারত, যে ভাষা সে কখনও শেখার সুযোগ পায়নি। বহু প্রত্যক্ষদর্শী ছিল যারা বলেছে ক্লারার যখন ভর হত তখন তার গলার স্বর সম্পূর্ণ পালটে যেত, জান্তব আওয়াজ করত, কুৎসিত গালিগালাজ বার হত তার মুখ দিয়ে ... এবং বেশ কয়েকবার মেয়েটি মাটি ছেড়ে চার পাঁচ ফুট শূন্যে উঠে ভেসে থাকত।”

— “কী বলছেন? এ তো অসম্ভব ব্যাপার!”

— “এইরকম বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে যুক্তিবাদী ও অবিশ্বাসী মানুষদের উপস্থিতিতেও। যেমন টেবিল চেয়ারের মতো ভারী জিনিস শূন্যে উঠে যাওয়া। আপনি হয়তো ড্যানিয়েল ডানগ্লাস হিউম (Daniel Dunglas Home) এর নাম শুনেছেন। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এঁকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ভদ্রলোক ইচ্ছেমতো শূন্যে ভেসে থাকতে পারতেন। এই ঘটনা তৎকালীন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিকদের সামনেই ঘটেছে। তৎকালীন ইউরোপের বঙ্গ সম্ভ্রান্ত মানুষ এর সাক্ষী ছিলেন। বিনয়বাবু মুখ খুললেন—“হ্যাঁ এঁনার কথা আমি পড়েছি। ইন্টারনেটেও পাওয়া যায়।” প্রফেসর বললেন “আসলে আমি কোনদিনই occult বা paranormal phenomenon বিশ্বাস করতাম না, সেইজন্য আগ্রহও ছিল না। এ সব তো আশ্চর্য ঘটনা।”

একটু হাসলেন হরেন্দ্রনাথ—“এইরকম বহু ঘটনা আছে যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। আপনাকে আর একজনের কথা বলি, আমি রিডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় পড়েছি ... পরে অন্যত্রও দেখেছি। লোকটির নাম অ্যারিগো। ব্রাজিলের এক অশিক্ষিত খনি শ্রমিক ছিল সে। তার মাঝে মাঝে ভর হত ... তখন তার ব্যক্তিত্বর আমূল পরিবর্তন হয়ে যেত। সে হয়ে যেত এক ডাক্তার ... সার্জন। বিনে পয়সায় মানুষের চিকিৎসা করত, কঠিন কঠিন অপারেশন করত বিনা অ্যানাস্থেসিয়া প্রয়োগে। যাদের ওপরে অপারেশন করত তারা কিছু যন্ত্রণাবোধ করত না, রক্তপাত হত খুবই সামান্য। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা নিজেরা এসে এরকম ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করেছেন। যখন ভর ঠিক হয়ে যেত তখন তার কিছুই মনে থাকত না। ভরের সময় সে এমন ওষুধ প্রেসক্রিপশন করেছে যা তখনও

বাজারে আসেনি, পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে আছে। বেশিদিন আগের কথা নয়, ১৯৭১ সালে মারা গেছে অ্যারিগো। তবে এক্ষেত্রে তার ওপর অশুভ নয়, শুভ শক্তি ভর করত।”

বিনয়বাবু বললেন “এঁর কথাও আমি পড়েছি। এঁকে বোধহয় Surgeon with a rusty knife বলা হত, কারণ হাতের কাছে যে ছুরি পেতেন তাই দিয়েই অপারেশন করতেন, পরিষ্কার পর্যন্ত করতেন না।”

— “হ্যাঁ, ঠিক। এর কীর্তিকলাপের সব ছবি তোলা আছে। আমি শুধুমাত্র বিদেশের ঘটনার উদাহরণ এইজন্য দিচ্ছি কারণ ওখানে এগুলোর রীতিমতো তদন্ত হয়েছ, এবং তার ফলে আসল ঘটনাগুলো ভাঁওতাবাজির থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে লোকে অলৌকিক কিছু দেখলে প্রথমেই বিশ্বাস করে নেয়। ফলে অনেক ম্যাজিকের বা হাতসাফাই এর খেলাও লোকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে মেনে নেয়। এর ফলে এখন সাধারণ মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তির সম্পর্কে বিশ্বাস হারাচ্ছে।”

প্রফেসর দাশগুপ্ত বললেন “কিছু মনে করবেন না, এদের কাছে আমি শুনেছিলাম আপনার পড়াশোনা তন্ত্র নিয়ে, আপনি তন্ত্র সাধনাও করেন। আপনার এইসব বিষয়ে আগ্রহ আছে জানতাম না।”

হরেন্দ্রনাথ হাসলেন একটু, “আসলে অতিপ্রাকৃত ব্যাপারগুলোর ওপর আমার আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। স্কুলে পড়তে পড়তেই দেবযান, মরনের পরে পড়েছি। রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেট করতেন ... সে বিষয়ে আগ্রহ জন্মেছিল। আর একটু বেশী বয়সে পড়েছি মাদাম ব্লাভাৎস্কি’র লেখা, এডগার কেস’এর বই। সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহ ছিলই, কারণ তন্ত্র নিয়ে চর্চা আমাদের পরিবারে ছিল।”

ট্রেন একটা বড় স্টেশনে থামতে কালীর ধূমপানের ইচ্ছে জাগল। বিনয়বাবুকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সিগারেটে টান দিয়ে বলল—“এই প্রথম হরেনবাবুকে আমি এত কথা বলতে শুনলাম। তন্ত্র বিষয়ে মহা পন্ডিত তো জানতাম, সঙ্গে এইসব বিষয়েরও খবর রাখেন আমার ধারণা ছিল না।”

বিনয়বাবু বললেন “আসলে দুজনেই পন্ডিত, এবং প্রায় একই বয়সের। কাজেই ওয়েভ লেংথ মিলে গেছে।”



মিত্তা এবং ওদিশের দোভাষী দারদিয় লোকটি ওঁদের পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়াল। সে নিজের নাম বলল ইন্দপিয়, অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রিয়। মিত্তা জিজ্ঞাসা করে বুঝলেন ওদের দেবতা ইন্দ্রের প্রিয় ... এই তার নামের অর্থ। লোকটি গ্রিক ভাষা বেশ ভালোই জানে বলে ওঁদের কথোপকথনে সুবিধাই হচ্ছিল। লোকটিকে বেশ পছন্দ হল তাঁদের। ইন্দ নামেই তাকে ডাকা শুরু করলেন। দেখা গেল ইন্দপিয়'র তাতে কোন আপত্তি নেই। ইন্দর'র মতে যে ধর্মের খোঁজে এরা এত দূর থেকে এসেছেন, তা খুব ভালো নয়। সে বন ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের বিষয়ে কিছু খবর রাখে। ও বলল "মূলত ওরা প্রকৃতির শক্তির উপাসক। উপাসনার উদ্দেশ্য ছিল সেই শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করা। ভাল আহ্বায়ক যাঁরা আছেন তাঁরা অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি নামাতে পারেন, দুর্ভিক্ষের সময় সন্ধান দিতে পারেন কোনদিকে গেলে পাওয়া যাবে শিকার করার উপযুক্ত পশু বা ফল ভর্তি বৃক্ষের অরণ্য। এঁদের রোগীকে আরোগ্য করার ক্ষমতাও আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ভালো আহ্বায়কদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বাড়ছে একশ্রেণীর ক্ষমতালিপ্সু উপাসকের সংখ্যা যারা অশুভ শক্তি, অপদেবতাকে আহ্বান করে, তাদের দিয়ে মানুষের ক্ষতি করে। ফলে এদের সবাই ভয় পায়, দেশের শাসক পর্যন্ত। এরা গোপনে নরবলি দেয়। তাদের দেশে বিদেশী মানুষ খুব একটা নিরাপদ নয়।"

মিত্তা সবার অগোচরে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি তো জানেন এই অশুভ শক্তির খোঁজেই এসেছেন তাঁরা। তাঁর নিজের রাজ্য, প্রতিবেশী পার্থীয়া, সেলুসিড, ব্যাকট্রিয়া, গ্রিস ... সর্বত্র একই মানসিকতা কাজ করছে। যে রাজা প্রজাদের হিতার্থে কাজ করেন, তাদের সুখ দুঃখের কথা শোনেন তিনি জনপ্রিয় হলেও যে রাজা বড় যোদ্ধা, অন্য দেশকে জয় করে পদানত করতে পারেন, যিনি অগণিত শত্রুসংহার করতে পারেন, তিনিই বেশি পূজ্য। শক্তের ভক্ত, শক্তির ভক্ত সবাই। এক এক সময় দেবী কুবেলির ধ্যানে বসে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় মিত্তার। ভাবেন 'তাহলে সভ্য মানুষ আর হিংস্র পশুতে কি পার্থক্য'। বেশ কয়েকটি যুদ্ধ দেখেছেন মিত্তা তাঁর জীবনে ... অপরিসীম ক্রূরতা, অনর্থক নরহত্যা, ধর্ষণ, ধ্বংসলীলা তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করে। মা

কুবেলি কি ব্যাবিলনের পুজ্য দেবী ননা, পার্থিয়দের অনাহিত কি গ্রিকদের দেবী অ্যাথিনা সবাই তো রনরঙ্গিনী ... কিন্তু সে শুধু দানব সংহারে, অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য ... তা নাহলে তো তাঁদের সবারই কল্যাণময়ী মাতৃরূপ।

ইন্দ তাঁদের বেশ কয়েকটি বন ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরে নিয়ে গেল। কিন্তু ওদিশের কোনটাই পছন্দ হল না। ওদিশ চায় পরীক্ষা করে নিতে যে, পূজারী বা আহ্বায়কদের অলৌকিক শক্তি আছে কিনা। কিন্তু এই প্রস্তাব দোভাষী ইন্দ'র মুখে শুনে অনেকেই খুব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় তাদের। এক দুবার তো সংঘাত হতে হতে বেঁচে গেছে।

একবার ইন্দ তাঁদের দেখা করায় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। শুভ্রকেশ, আবক্ষ শশ্রু, নিমীলিত নয়ন ... দীর্ঘদেহী কিন্তু শীর্ণকায় মানুষটি বসেছিলেন এক গাছের ছায়ায়। ইন্দ বলেছিল এই মহাত্মা ঋষি ত্রিকালদর্শী সর্বজ্ঞ। খুব কৌতূহল নিয়ে মিত্তা গিয়েছিলেন এই ঋষিকে দেখতে। এরকম সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের হিন্দ দেশে দেখা পাওয়া যায় শুনেছিলেন মিত্তা। এও শুনেছিলেন এঁদের অসাধারণ জ্ঞান, বিশ্বপৃথিবীর সব রহস্য এঁদের নখদর্পণে। ওদিশ অবশ্য এসব বিশ্বাস করে না, সে এসেছে একটু অনিচ্ছায়। অনেকক্ষণ পর সন্ন্যাসী চোখ খুললেন। তীব্র অন্তর্ভেদি দৃষ্টি ... মিত্তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর সবাইকে হতবাক করে শুদ্ধ ব্রিগো ভাষায় বললেন ... —"মাতা কুবেলির পুরোহিত ব্রিগো দেশের মিত্তা ... তোমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ তা সফল হবে না। তোমাদের দেশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। তোমাদের দেশের আরও পশ্চিমে রোম নামে যে দেশ আছে তাদের পদানত হবে ব্রিগো দেশ। এই তোমাদের পরিণতী।"

অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল ওদিশ। চিৎকার করে বলল "আমি বিশ্বাস করি না। এসব মিথ্যা কথা। ব্রিগো দেশ আবার পুরনো দিনের ঐশ্বর্য আর গৌরব ফিরে পাবে। আমি ফিরিয়ে আনব। সবাই রাজা ওদিশকে মান্য করবে, ভয় পাবে ... রাজা মিদাস, গর্দিয়স, ফেলপসের পর সবাই জানবে মহান রাজা ওদিশকে।" পিছন ফিরে চলে যেতে উদ্যত হয় ওদিশ।

আবার সেই ঋষির গম্ভীর গলা শোনা যায় "হে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ওদিশ, তুমি যে অশুভ শক্তির সাহায্য নিতে এসেছ তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে না।

তোমার ফিরে যাওয়াই মঙ্গল। তবে আমি জানি তুমি আমার কথা শুনবে না"। ঋষি চোখ বন্ধ করে আবার ধ্যানস্থ হয়ে যান।

মিত্তা অবাক হয়ে বললেন "এই মহাত্মা আমাদের নাম জানলেন কী করে, কী করেই বা জানলেন আমরা কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি?"

ওদিশ তখনও ক্রুদ্ধ— "সে যে করেই হোক। এর কথা আমি মানি না। আমরা যে কাজে এসেছি তাতে সফল হবই। চলুন মিত্তা, চল ইন্দ।"



টম এখন অনেকটাই সুস্থ। সে আর জেরেমি খুব ভালো করেই বুঝেছে লামার সেবা যত্নেই এ যাত্রা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে টম। পুঁথির লোভ আর তাদের নেই। সেটা শুধু লামার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতই নয়, ওরা এটাও বুঝতে পারছে যে পুঁথিটা হাতে পাওয়ার জন্য আরও একটি দল আছে, তারা অনেক বেশি মরিয়া, অনেক বেশি বিপজ্জনক। কি আছে এই পুঁথিতে, যার জন্য তিনজন মানুষের প্রাণ গেছে? শুধু কি অ্যান্টিক হিসেবে এর দামের জন্য? তা মনে হয় না। তাছাড়া ঐ যে দুজন জোম্বি এসেছিল ... তাদের কথা ভাবলে জেরেমির এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। সে শুনেছে জ্যামাইকা, হাইতি, পোর্তো রিকো এসব জায়গায় যারা ভুডু জানে তারা মরা মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। তাদের জোম্বি বলে। এই নেপালে তাদের দেখা পাবে ভাবেনি সে।

তারা পরের দিন সূর্য ওঠার আগে, লামার কাছে বিদায় নিয়ে রওনা দিল। পুলিশের নজর এড়ানোর জন্য অনেক লম্বা পথ নিয়েছে। কাঠমান্ডু থেকে ওরা গাড়িতে যাবে জনকপুর ধাম। সেখান থেকে বর্ডার পার হয়ে ঢুকবে বিহারের জয়নগরে। সেখান থেকে দ্বারভাঙা হয়ে যাবে পাটনা। পাটনা থেকে দিল্লি। ঐ ভোরবেলাও ওদের দিকে নজর রাখছিল সেই দুজন মুস্তাংবাসী। এদের রিভলভারের গুলিতে তাদের কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। তারা দোরজের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করছে বোঝা যায় না। কিন্তু দোরজে কি করে যেন জানতে পারল পুঁথিটা এই দুই শ্বেতাঙ্গর কাছে নেই। সে এদের নির্দেশ দিল ওদের নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এখন শুধু বৌদ্ধ বিহারের ওপর দিন রাত নজর রাখতে হবে। মহা গ্রন্থ ওখানেই আছে।

বিনয়বাবু আগে থেকেই মনীশ আর ইন্সপেক্টর প্রধানকে খবর দিয়েছিলেন

যে তাঁরা কাঠমান্ডু আসছেন। এও জানিয়েছেন যে, পুঁথিটা তিনি আর নিয়ে যেতে আগ্রহী নন। ইন্সপেক্টর আর মনীশ দুজনেই এ কথা জেনে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। পুঁথিটা মনাস্টারি থেকে বের করে কলকাতায় পাঠানো নিয়ে দুজনেরই চরম দুশ্চিন্তা ছিল। এটা পরিষ্কার দোরজে পুঁথিটা ফিরে পাবার জন্য মরিয়া। যত রকম শক্তি তার আয়ত্তে আছে সব প্রয়োগ করবে সে ওর নিজের সম্পত্তির পুনরুদ্ধারে। তাছাড়া ওদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পুঁথিটা চরম দুর্ভাগ্য ডেকে আনতে পারে যার কাছে ওটা থাকবে। বিনয়বাবুরা কাঠমান্ডু পৌঁছে মনাস্টারির কাছে একটা ছোট হোটেলে উঠলেন। জায়গাটা শহরের নিম্নবিত্ত এলাকায়। সাধারণত পর্যটকরা এদিকটা থাকে না, কারণ পশুপতিনাথ বা অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলি থেকে জায়গাটা দূরে। মনীশ লামাকেও খবর দিয়েছিল বিনয়বাবু আসছেন, সঙ্গে আরও তিনজন আসবেন শুধুমাত্র পুঁথিটা দেখতে। ইন্সপেক্টর প্রায় নিশ্চিত যে দোরজে এখন কাঠমান্ডুতে। তবে কাঠমান্ডুর ভীড়ে দোরজের খোঁজ করা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো ব্যাপার। ইন্সপেক্টর প্রধানের উপরওয়ালা অফিসাররা, দেশের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র দফতর সবাই এখন এই ব্যাপারে জড়িত, আমেরিকান দূতাবাসের ঐ সৈনিকটির রহস্যজনক মৃত্যুর পর। পুলিশ দফতরের ওপর প্রচুর চাপ আসছে 'অপরাধী'দের খুঁজে বার করার জন্য। কিন্তু নিচের স্তরের পুলিশদের মধ্যে পুরো ঘটনাটা রটে যাওয়ার ফলে, দোরজেকে খুঁজে বার করা ডিউটি কেউ নিতে সাহস পাচ্ছে না। মানুষের সঙ্গে লড়তে তারা ভয় পায় না, কিন্তু অতিপ্রাকৃত শক্তির সামনে তাদের বন্দুকের গুলি কি কাজে আসবে? ইন্সপেক্টর মনাস্টারি পাহারা দেবার দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন ইচ্ছে করেই। লামাকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, তাঁর কিছু হলে তিনি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন না। বাছা বাছা কিছু কনস্টেবল, দুজন সহকারী নিয়ে মনাস্টারি ও সংলগ্ন এলাকার ওপর চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশেপাশে আলো বাড়ানো হয়েছে।

বীরগঞ্জ থেকে বাসে কাঠমান্ডু পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। তাই ওঁরা সেদিন বিশ্রাম নিয়ে পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ সেরেই লামা'র সঙ্গে দেখা করতে যাবেন ঠিক হল। প্রফেসরের বয়স হয়েছে, এত ধকল অভ্যাস নেই। পরদিন সকালে মনীশ একটা সাত সিটের বড় গাড়ি নিয়ে এল। সঙ্গে একজন

কনস্টেবল, তার হাতে স্টেনগান। এঁরা একটু হকচকিয়ে গেলেও মনীশ জানাল ইন্সপেক্টর প্রধানের নির্দেশেই একে তাঁদের দেহরক্ষী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। লামা সাদরে এঁদের অভ্যর্থনা করলেন। সবাইকে নিয়ে মূল প্রার্থনা কক্ষে গেলেন তিনি। তথাগতর মূর্তির সামনে বসিয়ে ভিতরে গিয়ে পুঁথিটা নিয়ে এলেন তিনি। প্রফেসর দাশগুপ্ত সাগ্রহে হাতে নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে দেখতে লাগলেন। হাতে নিয়ে পৃষ্ঠাগুলো পরীক্ষা করে বললেন "তুমি ঠিক বলেছ বিনয়, এগুলো পার্চমেন্টের ওপরই লেখা। পার্চমেন্ট গ্রিস আর আনাতোলিয়াতেই লেখার জন্য ব্যবহার হত প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকে। তখন নাম ছিল পারগামোনাম, গ্রিসের পারগামন শহর থেকে।"

লামা আর হরেন্দ্রনাথ নিজেদের মধ্যে ধর্মবিষয়ক আলোচনায় ডুবে গেলেন। বজ্রযাণী বৌদ্ধ ধর্মের অনেক দেবীর সঙ্গে তন্ত্রধর্মের মাতৃদেবীর বিভিন্ন রূপের মিল নিয়ে, উপাসনার পদ্ধতি নিয়ে ওঁদের আলোচনার মুগ্ধ শ্রোতা কালী। প্রফেসরও আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব তাঁর বিষয়, কিন্তু এঁদের দুজনেরই নিজ নিজ বিষয়ে গভীর জ্ঞান। লামার হিন্দি একটু ভাঙা ভাঙা, কিন্তু তাতে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় না। লামা তাঁর মত জানালেন "দোরজে এই পুঁথিটার সাহায্যে শুধু প্রেতসিদ্ধ বা পিশাচ সিদ্ধ হবার সাধনা করছে না, ও অমরত্ব পাওয়ার চেষ্টা করছে।" প্রফেসর মাথা নাড়লেন, তিব্বতি হরফের লেখা যতটুকু অনুবাদ হয়েছে তাতে তাঁরও একই কথা মনে হয়েছে। নানা জটিল এবং বিভৎস অভিচারের কথা লেখা আছে পাতায় পাতায়। তার মধ্যে নরবলি, নবরক্ত পান ... সব এই উদ্দেশ্যেই। হরেন্দ্রনাথ বললেন "আপনার অনুবাদ থেকে যা মনে হচ্ছে ফ্রিজিয়ান ভাষায় মাতা কুবেলির কাছে প্রার্থনা লেখা আছে, মা'কে অনুরোধ করা হচ্ছে অশুভ শক্তি বিনাশ করতে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন পূজা বা উপায় লেখা নেই এই অশুভ শক্তি কী করে অকেজো করে দেওয়া যায় সে বিষয়ে। এর জন্য আমরা যা জানি তাই করতে হবে। "লামাও তাই বললেন। হরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে পেয়ে তিনি খুব খুশি। হরেন্দ্রনাথ বললেন। "তাহলে আজ আমি পশুপতিনাথ আর গুহ্যেশ্বরী মন্দির দর্শন করে আসব। আজ রাত থেকেই শুরু হবে আমাদের পূজা।"



সন্ন্যাসীর হতাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণী শুনে মিত্তা খুব মুষড়ে পড়লেও ওদিশের জেদ যেন আরও বেড়ে গেছে। সে ইন্দকে চাপ দিচ্ছে বন ধর্মাবলম্বীদের আরও মন্দির নিয়ে যাবার জন্য। আরও উত্তর পূর্ব দিকে যাচ্ছে ওদের দল। যাত্রাপথ অত্যন্ত বন্ধুর, উচ্চতার জন্য ধীরে ধীরে চলতে হচ্ছে। সঙ্গে ঘোড়াগুলির জন্য অনেক জায়গায় ঘাসও পাওয়া যাচ্ছে না। ইন্দ একদিন জানাল এবার যে দিকে যাচ্ছে সেদিকে অনেকটাই হয়তো বরফে ঢাকা, কাজেই এতগুলি ঘোড়া সঙ্গে না নিয়ে যাওয়াই ভালো। স্থির হল মিত্তা, ওদিশ আর ইন্দ ছাড়া দুজন সৈনিক ও একজন দাস যাবে ওদের সঙ্গে পদব্রজে। বাকিরা ঘোড়া নিয়ে কোন ছোট পাহাড়ি গ্রামে অপেক্ষা করবে ওদের জন্য, কার্যসিদ্ধি হয়ে ফিরে আসা অবধি। সঙ্গীদের একটি গ্রামে অপেক্ষারত রেখে ছোট দলটি দুর্গম পার্বত্য পথে এগিয়ে গেল এই পথে। পাঁচ দিন চলার পর এক ছোট টিলার ওপর একটা পাথরের বাড়ি চোখে পড়ল দূর থেকে, তার দেওয়ালে এক অজানা চিহ্ন আঁকা। ইন্দ জানাল, বন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির। এরকম নির্জন জায়গায় যখন তখন সেখানে কোন প্রাজ্ঞ উপাসক থাকা সম্ভব। আগে যেখানে যেখানে যাওয়া হয়েছে সেগুলি সব লোকালয়ে, যারা আছে তারা পূজারী আর ধর্মপ্রচারক। মিত্তা বললেন "এ কীরকম মন্দির? সাদামাটা একটা পাথরের বাড়ি দেখে তুমি কি করে বুঝলে এটা মন্দির?" ইন্দ বলল "দেওয়ালে ঐ চিহ্নটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে এটি বন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার স্থান। আগে যে সমস্ত মন্দিরে গিয়েছি সেখানেও এই চিহ্ন ছিল, আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেননি। এই চিহ্ন আমাদের ধর্মেও ব্যবহার হয়, কিন্তু এদের বিপরীত দিকে। এই চিহ্নকে আমরা বলি স্বস্তিকা।"

মন্দিরে মাত্র তিনজন মানুষ দেখা গেল। ওরা কাছে পৌঁছতেই তারা বাইরে এসে নিজেদের ভাষায় প্রশ্ন করল 'তারা কোথাকার মানুষ কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে ... ইত্যাদি'। ইন্দর সঙ্গে তাদের দীর্ঘ সময় আলোচনা হল। তারপর ইন্দ এঁদের জানাল 'ওদিশ যা খুঁজছে ... জ্ঞানী এবং শক্তিধর উপাসক ... সেরকম কেউ এখানে নেই। তবে কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে সে সন্ধান এরা জানে। এখান থেকে তিন দিনের পথ, আরও উত্তরে। দুর্গম পথ, হিংস্র শ্বাপদ

থাকা বিচিত্র নয়। এদের একজন পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু দুটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে তাকে।’

ওদিশ বলল “দেব, কিন্তু সেখানে পৌঁছে। আর যদি দেখি যা আমি খুঁজছি তা সেখানে নেই তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ মুণ্ডচ্ছেদ করব এই খর্বনাসা পীতবর্ণের মানুষের।”

ইন্দ হাসল “মহামান্য ওদিশ, দেশটা কিন্তু এই পীতলবর্ণ খর্বনাসা মানুষদের। এরকম ভাবনা ভাবাও বিপজ্জনক। এদের ভাবলেশহীন মুখ, আপাত শ্লথ গতি দেখে ভাববেন না এরা ভীরু। এরা অত্যন্ত দক্ষ তীরন্দাজ, অসি চালনাতেও এদের জুড়ি নেই।”

এরপরের তিন দিনের যাত্রা ছিল এতদিনের মধ্যে কঠিনতম। অধিকাংশ জায়গা বরফে ঢাকা, সেজন্য চলা কঠিন। পথ বলে কিছুই নেই, কীভাবে যে এই স্থানীয় লোকটি পথ চিনে চলেছে তা এঁদের পক্ষে বোঝা মুশকিল। তবে সে এদের থেকে অনেক স্বচ্ছন্দ। জমা বরফ খুঁড়ে বার করছে একরকম গাছের নরম শিকড়, যা খেতে শুধু সুস্বাদুই নয়, যথেষ্ট শক্তিদায়ক। দ্বিতীয় দিনে চোখে পড়ল কয়েকটি পাহাড়ি ছাগল। লোকটি নিপুণ শরসন্ধানে একটিকে বধ করল। ওদিশের দাস বলল “এখানে আগুন জ্বালাবার কি উপায়? পাহাড়ি ছাগের মাংস শক্ত হয়, অনেকক্ষণ সিদ্ধ করা দরকার”। স্থানীয় লোকটি কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ে এল শুকনো কিছু গাছের ডাল ... সবাই অবাক হল ... ‘জাদু জানে নাকি’। সেদিন সবার ভূরিভোজ হল। রাত কাটানোর আশ্রয়ও খুঁজে বার করল স্থানীয় লোকটি। পাহাড়ের গায়ে প্রায় লুকিয়ে থাকা একটি গুহায় সবাই রাত্রিবাস করল। শুধু ওদিশ ঘুমাতে পারেনি কাছেই ঘুমিয়ে থাকা ঐ খর্বনাসা লোকটির শরীরের দুর্গন্ধে। তৃতীয় দিনের বিকালের দিকে ওরা এসে পৌঁছল ওদের গন্তব্যস্থানে। চারদিকে বরফের মধ্যে বেশ বড় একটি পাথরের বাড়ি। আশেপাশে কয়েকটি ছোট আকারের বাড়িও আছে। প্রত্যেকটি বাড়ির দেওয়ালে ঐ একই চিহ্ন আঁকা। স্থানীয় লোকটি ওদের অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে গেল। এরা দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে সবাই ক্লান্ত, যে যেখানে পারল বসে পড়ল। ওদিশ ও মিত্তা একট বড় পাথরের ওপর বসলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর, সূর্যাস্তের ঠিক আগে ওদের পথপ্রদর্শকের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল এক বিশালদেহি মানুষ, স্থানীয় মানুষদের মতো ঢিলেঢালা

পোষাক পরনে, তবে মাথায় এক অদ্ভুত শিরস্ত্রাণ। এই দেশে আসা অবধি এত দীর্ঘকায় মানুষ আর এদের চোখে পড়েনি। পিছনে পিছনে এল চারজন সশস্ত্র লোক, তাদের হাতে এক অদ্ভুত ধরনের অসি।

বিশালদেহি মানুষটি শুধু এখানকার নয়, আশেপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যত বন ধর্মের উপাসনালয় আছে তার প্রধান উপাসক। তিনি ওদের সাদরেই অভ্যর্থনা জানালেন। প্রধান উপাসক একটু একটু গ্রিক ভাষাও বলতে পারেন। তিনি নাকি জ্ঞান অর্জন করার জন্য বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। এদেশের মানুষের বয়স বোঝা বেশ কঠিন। মনে হয় উনি মিত্তার বয়সী বা হয়তো কিছুটা বড়। মিত্তা তাঁর নিজের ধর্মের প্রধান পুরোহিত শুনে অবশ্য কোন ভাবান্তর দেখা গেল না তাঁর মধ্যে।

পরের দিন ওদের পথপ্রদর্শক দুটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বিদায় নিল। তারপর ওঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হল। ইন্দ'র সাহায্যও নিতে হল কথোকপথনে, কারণ এই আলোচনার জন্য প্রধান উপাসকের গ্রিক ভাষায় জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না। ওদিশের উদ্দেশ্য জেনে কি উপাসকের ভাবলেশহীন মুখে একটু হাসির রেখা দেখা গেল? ঠিক বোঝা গেল না। তিনি বললেন "কাল রাত্রে আমরা উপাসনায় বসব। তুমি তাতে উপস্থিত থাকো, দেখ আগে আমাদের কঠিন সাধনা তোমার সহ্য হয় কিনা। তারপর দেখা যাবে। তবে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে যথেষ্ট সময় লাগবে, কষ্টসাধ্যও বটে। তোমাদের এখানে অন্তত পাঁচ বছর থাকতে হবে।

পাঁচ বছর থাকার কথা শুনেও ওদিশের বিশেষ কোন ভাবান্তর হল না। এই ধরনের বিশেষ ক্ষমতা আয়ত্ত করতে যে দীর্ঘ সময় লাগবে সে অনুমান করেছিল। কিন্তু পাঁচ বছর এইরকম নির্জন রুক্ষ জায়গায় থাকতে হবে নিজের দেশ থেকে এত দূরে এই চিন্তা মিত্তাকে বিষন্ন করে তুলল। ওদিশকে ছেড়ে যাবার কথাও তিনি চিন্তা করতে পারেন না। আবার মাতা কুবেলির মন্দিরের পূজারী হিসেবে তিনি নিজের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন এই ভাবনা তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করছে। সৈন্যরা পাঁচ বছর এখানে থাকতে হতে পারে শুনে খুবই মুষড়ে পড়ল। তবে তারা এসেছে ওদিশের দেহরক্ষী হিসেবে, কাজেই ভালো লাগুক আর না লাগুক, ওরা কোন প্রশ্ন তুলল না। দাসটির অবশ্য কিছু যায় আসে না। দাস হিসেবে জন্মেছে, দাস পিতামাতার গর্ভে, তার জীবন

এভাবেই কাটবে, একদিন দাস হিসেবে তার মৃত্যু হবে। কাজেই জমজমাট গর্দিয়ন শহরে দাসবৃত্তি করছে না কি এক অজানা দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে কোন অজানা ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরে, তাতে তার কিছু এসে যায় না। অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছে সে।

ইন্দকে থাকতে হল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কারণ এখানকার ভাষা ওদিশকে শিখতে হলে ইন্দ'র সাহায্যের প্রয়োজন। প্রধান উপাসকের গ্রিক ভাষার জ্ঞান সীমিত, তাতে মোটামুটিভাব বিনিময় করা সম্ভব হলেও তাদের ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ওদিশকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দেশের ভাষা শিখতে হবে। ইন্দ বলল খুব বেশি হলে সে মাস ছয়েক এখানে থাকবে, তারপর সে তার নিজের দেশে ফিরে যাবে। সেখানে তার প্রেয়সী অপেক্ষায় আছে। সে ফিরলেই তাদের বিয়ে হবে। অবশ্যই ওদিশের কাছে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাবি করেছে সে ছ-মাস থাকার জন্য।

উপাসনাগৃহের মাটির নিচে আছে গুপ্ত কক্ষ। সাধারণ ভক্তদের জন্য উপরের পূজার ঘর আছে, যেখানে দিনের আলোয় চার প্রকৃতি দেব দেবীর পূজা হয়। কিন্তু নিচের ঘরে সাধারণ ভক্ত এমনকি অল্পবয়সী পূজারিদের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে কী আছে কেউ জানে না। শুধুমাত্র প্রধান উপাসক এবং কয়েকজন গুহ্যমন্ত্রে দীক্ষিত উপাসকের প্রবেশাধিকার আছে সেখানে। সেখানে যাওয়ার অধিকার ওদিশের তখনই জন্মাবে যখন উপাসক হিসাবে তার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। ওদিশ খুব দ্রুত এই দেশের ভাষা শিখে নিল। এদের মতো উচ্চারণ অবশ্য করতে পারে না তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না। ওদিশকে প্রধান উপাসক তাদের ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন প্রথম মাসেই। মিত্তার ঘোরতর আপত্তি ছিল ওদিশের ধর্মান্তরে। কিন্তু দীক্ষা না হলে এই ধর্মের গুপ্তবিদ্যা শেখার সুযোগ কোনদিনই হবে না তা প্রধান উপাসক গিয়ালপো পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যখন ওদিশ তাকে এখানে আসার উদ্দেশ্য জানিয়েছিল। তাছাড়া গিয়ালপো একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন ওদিশের কাছে ... ফিরে গিয়ে ওদের ধর্ম প্রচার করতে হবে নিজের দেশে। ওদিশ হবে ব্রিগো দেশে বন ধর্মের প্রথম প্রচারক ও উপাসক। ওদিশ বুঝেছিল এছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। তাছাড়া এতে ওর সুবিধাই হবে। তাদের নিজেদের ধর্ম ব্রিগো দেশের মানুষেরা এখনও পালন

করে বটে কিন্তু বণিকরা নানা দেশ ঘুরে এসে অন্য অনেক দেশের ধর্মের চমকপ্রদ সব গল্প করে, গ্রিসের থেসালির মন্দিরের ভবিষ্যদবক্তাদের কথা বলে যাদের কথা শুনে বণিকরা সমুদ্রযাত্রার দিনক্ষণ ঠিক করে। আলেকজান্দ্রিয়া শহরে নাকি এক মন্দির আছে যার সামনে রোজ সকালে পবিত্র আগুন জ্বালানো হয়, তখন মন্দিরের দরজা নিজে থেকেই ধীরে ধীরে খুলে যায়। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে ভক্তরা মন্দিরের দেবতার জয়ধ্বনি করে। ওদিশের বয়স কম, অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিছুটা হঠকারিতাও ওর স্বভাবের মধ্যে আছে কিন্তু সে তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী। মনুষ্যচরিত্র সে খুব ভালোই বোঝে। এই অশান্ত সময়ে মানুষকে এক উদ্দেশ্যে একজোট করার একমাত্র উপায় হল ধর্ম ... এমন এক ধর্ম যা সবাইকে মুগ্ধ করে, অভিভূত করে। তাদের নিজেদের ধর্মের ভিত্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। গ্রিক অধিকারে থাকার জন্য অনেক ব্রিগোবাসী গ্রিক দেবদেবীর পূজার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। মাতা কুবেলির মন্দিরের থেকে এখন এথিনার মন্দিরে বেশি ভীড় দেখা যায়। পার্থিয়রা আবার সবাই এক ধর্ম বিশ্বাস করে যা আরও অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই ধর্মের নাম মাজদাইয়াসনা ... তারা সবাই অগ্নি উপাসক। এই ধর্ম পার্থিয়দের একজোট করেছে, শক্তিশালী করেছে। মিত্তার মতো যাজকদের সবাই ভক্তি করে কিন্তু ভয় করে না। অলৌকিক কিছু করে না দেখালে মানুষ ভয় পায় না। আর কে না জানে ভয় থেকেই আসে ভক্তি। তাই ওদিশ হতে চায় অলৌকিক শক্তির অধিকারী, তার জন্য ধর্মান্তরিত হতেও অসুবিধা নেই যদি সেই ধর্ম সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করে, তাদের মধ্যে ভয়মিশ্রিত ভক্তির জন্ম দেয়। তখন দলে দলে ব্রিগোবাসী এই ধর্ম গ্রহণ করবে আর আসবে তার পতাকার নীচে। ওদিশ হবে দেশের একছত্র অধিপতি। কে বলতে পারে একদিন সে এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে।

ছ'মাস পর ইন্দ বিদায় নিল। তারপর একদিন প্রধান উপাসক গিয়ালপো ওদিশকে বললেন আজ তোমার দীক্ষা হবে গুহ্য মন্ত্রে। আজ গভীর রাত্রে সাধারণ উপাসকরা যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন তোমাকে আমি নিয়ে যাব গুপ্ত কক্ষে। ওদিশ আর মিত্তার শয্যা একই কক্ষে। তাই মিত্তাকে গোপন করে যাওয়া সম্ভব নয়। ওদিশ মিত্তাকে বলে গভীর রাতে কক্ষের বাইরে এসে দেখে হাতে একটি প্রদীপ নিয়ে গিয়ালপো তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

দীক্ষার জন্য সে সব ক্রিয়া, আচার ওদিশকে করতে হল তার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। মাটির নিচের গুপ্তকক্ষে আরও পাঁচজন শিষ্য ছিল গিয়ালপোর। তারা একটা অগ্নিকুন্ড তৈরি করে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। অগ্নিকুণ্ডে মাঝে মাঝেই কিছু একটা তারা ঢালছিল মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ... কটু গন্ধে আর ধোঁয়ায় ঘর ভরে যাচ্ছিল। গিয়ালপো আসার পর তারা ঘরের একদিকের একটা পর্দা সরিয়ে দিল। দেখা গেল উঁচু এক বেদির উপর বিশাল এক ভয়ালদর্শন মূর্তি। তখন চারিদিকে তাকিয়ে ওদিশ দেখল মাটির নিচের এই ঘরের সব দেওয়ালে ভয়ানক সব অপদেবতার ছবি আঁকা।

দীর্ঘ সময় ধরে সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ আর আগুনে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আহুতি দেওয়া হল। অবর্ণনীয় দুর্গন্ধে ভরে গেল ঘর। এরপর একটি পাত্র আর একটি ধারালো অস্ত্র হাতে ধরে দাঁড়ালেন গিয়ালপো। এক এক করে সব শিষ্য সামনে এসে নিজের নিজের হাতের তর্জনী চিরে রক্ত ঢালল ঐ পাত্রে। গিয়ালপো নিজেও দিলেন। শেষে ওদিশের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ওদিশও ওঁর নির্দেশ মতো নিজের আঙুল কেটে রক্ত দিল পাত্রে। এরপর এক কালচে রঙের তরল ঢেলে পাত্র কানায় কানায় ভরা হল। ওদিশ অনুমান করল কোন রকমের মাদক। তবে তার পরিচিত কোন মদ নয়। তাদের দেশে মধু থেকে যে উৎকৃষ্ট মদ তৈরি হয় তার স্বাদ গন্ধই আলাদা। গ্রিকরা আর রোমানরা আঙুর থেকে যে মদ তৈরি করে তাও খুবই সুস্বাদু। এদেশেও একরকমের হাল্কা মাদক ওরা পান করেছে যা শস্যদানার ওপর গরম জল ঢেলে তৈরি করা হয়। এই কটু গন্ধ তরল আগে কখনও দেখেনি ওদিশ। গিয়ালপোর-এর পরের নির্দেশ শুনে হতচকিত হয়ে যায় ওদিশ। তাকে এক চুমুক ঐ রক্ত মেশানো তরল পান করতে হবে। এইভাবেই ও তাদের সংঘের একজন হবে। অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হলেও চুমুক দিল ওদিশ। তারপর একে একে সবাই চুমুক দিল পাত্রে, গিয়ালপো সমেত। কয়েকবার হাতে হাতে ঘুরে শেষ হল সেই তরল। এরপর আবার শুরু হল মন্ত্রোচ্চারণ। ওদিশের একটু একটু মাথা ঘুরছিল। একসময় তার মনে হল বেদির ওপরের ওই ভয়াল মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে, তার চোখ যেন জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড। ঘরের মধ্যে ধোঁয়া ভরে গেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ওদিশের ... তারপর আর তার কিছু মনে নেই।



দোরজে স্থানীয় বন ধর্মাবলম্বীদের সাহায্য নিয়ে মনাস্টারির কাছে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। এখান থেকে মনাস্টারি দেখা যায়। সেখানে নিয়ে এসেছে তার পিশাচ সাধনার উপকরণ ... আর ... তার ভক্তরা বছর দশেক বয়সের একটি অনাথ ছেলেকে নিয়ে এসেছে দুর গ্রাম থেকে। ভূমিকম্পে ছেলেটি তার সব আত্মীয় স্বজনদের হারিয়েছে। তাকে আনা হয়েছে খাবার লোভ দেখিয়ে। গ্রামে তাকে খেতে দেবার কেউ ছিল না। শহরের লোকের বাড়ি কাজ করবে, তার বদলে পেট ভরে খাওয়া পাবে এই বলে তাকে আনা হয়েছে। কিন্তু আসল কারণ অন্য।

মনাস্টারির ওপর নজর রাখে এখন আরও বেশি লোক। তবে তারা আগের সেই দুই রহস্যময় মুস্তাংবাসী নয়। তাদের পোশাক লোকের চোখে পড়তে পারে তাই স্থানীয় ভক্তদের কাজে লাগিয়েছে দোরজে। তাদের মুখেই সে জেনেছে মনাস্টারিতে চব্বিশ ঘন্টা পুলিশ পাহারার কথা। অবশ্য তা নিয়ে দোরজের কোন চিন্তা নেই। মনাস্টারিতে অন্য মানুষদের আনাগোনা সম্পর্কে খবর পেয়ে সে নজরদারি আরও বাড়িয়েছে, পুঁথিটা যেন বাইরে না যায়। তার অশরীরী ভৃত্যরা কাঠমান্ডু শহরের কোন কোন জায়গায় যেতে পারে না। পশুপতিনাথ আর গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের ত্রিসীমানার মধ্যে দোরজের কোন ক্ষমতা কাজ করে না। কাজ করে না স্বয়ম্ভুনাথ পাহাড়ে, বুঢ়া নীলকণ্ঠ মন্দির এলাকায় আর বৌধায়। এখানে কোন অশুভ শক্তির প্রবেশ নিষেধ।

এই বৌদ্ধবিহারেও তার অতিপ্রাকৃত শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, বিশেষ করে এখন অবিরাম 'ওম মনিপদ্মে হুম' মন্ত্র জপ হচ্ছে বলে। পুরনো, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এই বাড়িটা ঘিরে যেন এক শক্তিবলয় কাজ করছে। এটা ভাঙার জন্য তাকে আরও শক্তিশালী হতে হবে। ওই শ্বেতাঙ্গ চোরটা তার অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে। তার একটা বলি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, সবচেয়ে বড় কথা তার পবিত্র পুঁথি, তার শক্তির উৎস, হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। মনাস্টারির শক্তিবলয় ভেঙে ভিতরে ঢুকতে হলে তার নিজের শক্তি আরও বাড়াতে হবে, আহ্বান করতে হবে আরও শক্তিশালী অপদেবতাদের। তার জন্য বলি প্রয়োজন। এই দশ বছর বয়সের ছেলেটাকে আনা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে।

রক্ত না হলে আহ্বান জোরালো হয় না। তবে দোরজে যে অপদেবতাকে আহ্বান করতে চাইছে, একান্নটি বলি সম্পূর্ণ না করে তাকে ডাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ তা সে বোঝে। একান্ন বলি সম্পূর্ণ হলেই তার শক্তি হবে এদের নিয়ন্ত্রণ করার। তার আগে এই ভয়ানক অপদেবতাদের পৃথিবীতে এনে নিজের বশে রাখা কঠিন কাজ, একটু ভুল হলে তার প্রাণসংশয় হতে পারে। কিন্তু তাকে এই ঝুঁকি নিতেই হবে। দোরজের গণনা অনুযায়ী আগামী কাল সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। কাল রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হবে, চাঁদ থাকবে না আকাশে। এই সময়ে বলি দিয়ে এক মহাশক্তিধর অপদেবতাকে আবাহন করতে হবে। তবেই সম্ভব হবে পুঁথিটা উদ্ধার করা।

হরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কালীকিঙ্করও গেল পশুপতিনাথ ও গুহ্যেশ্বরী মন্দির দর্শন করতে। মনীশ নিজের থেকেই বলল সে নিয়ে যাবে দর্শন করাতে। তবে সে মন্দিরের বাইরেই থাকবে, কারণ তার এখন অশৌচ চলছে।

সৌভাগ্যবশত পশুপতিনাথ মন্দিরে সেদিন ভিড় কম ছিল। সুন্দরভাবে দর্শন হল। তার পর দুজনে গেলেন মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যেই উন্মুক্ত ভৈরবের মন্দির দর্শন করতে। পশুপতিনাথ মন্দিরের পিছনের দরজা দিয়ে বার হয়ে গুহ্যেশ্বরী মন্দির কিছুটা দূরে, তবে হেঁটে যাওয়া যায়। মিনিট পনেরো হেঁটেই ওঁরা পৌঁছে গেলেন সেখানে। একটা সরু নদীর ওপর লোহার ব্রিজ পার হয়ে যেতে হয় মন্দিরে। প্রবেশদ্বারের পর পাথরের সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা উঠে সামনে এক পাথরে বাঁধানো চত্বর। তার মাঝখানে মন্দির। নেপালের সর্বত্র যেমন দেখা যায়, সুন্দর কাঠের কারুকার্য চারিদিকে। এখানে পুণ্যার্থীদের ভিড় আরও কম আজ। এখানে হরেন্দ্রনাথ ও কালী অনেকক্ষণ বসে ধ্যান করতে পারলেন। পশুপতিনাথ মন্দিরে বসা সম্ভব ছিল না, পুলিশের লোকরা বসতে দেয় না। চোখ খুলে হরেন্দ্রনাথ দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে এক জটাধারী সাধু, যেন তাদের ধ্যান ভাঙার অপেক্ষা করছেন। তাঁরা উঠে দাঁড়াতে হাত বাড়িয়ে ওদের হাতে কটা ছোলা ভাজা, চিনেবাদাম আর মিছরি দিলেন ... "মাঈকি পরসাদ, খা লে বেটা" দুজনেই ভক্তিভরে প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে মুখে ফেললেন। কালী অর্ধেকটা পকেটে রাখতে যাচ্ছিল, তখন সাধু বললেন "বিনয় ওর পরফেসর সাহাবকে লিয়ে ম্যায় আলাগসে দেতা হুঁ।"

দুজনেই হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন সাধুর দিকে। তিনি আবার হাতের

মুঠো খুলে প্রসাদ দিলেন কালীকে। কিন্তু কালী হলফ করে বলতে পারে যে আগের বার ওঁর হাতে যা ছিল সবই ঢেলে দিয়েছিলেন ওদের দুজনকে। সঙ্গে ঝোলাঝুলিও কিছু নেই, পরণে একটা কৌপীন শুধু। বিনয় আর প্রফেসরের কথাই বা জানলেন কী করে? প্রসাদ দিয়ে সাধুজি হরেন্দ্রনাথকে যা বললেন তার অর্থ 'সামনে মহা বিপদ। কাল রাত্রে সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে। মা রুদ্রচন্ডীর পূজা করতে হবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। হরেন্দ্রনাথ যেন পূজার প্রস্তুতি নেন'। ... এই বলে তিনি হাঁটা দিলেন। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতগতিতে তাঁকে নেমে যেতে দেখল। কালী "কি মহাপাপী আমি, প্রণাম পর্যন্ত করলাম না সাধু মহারাজকে" বলে পিছন পিছন দৌড়ল। কিন্তু নীচে নেমে আর কারোকে দেখতে পেল না। সে জায়গাটা অনেকটাই খোলা ... কোথায় গেলেন তিনি?

কালীকিঙ্কর বিনয়বাবুর মুখে শুনেছিল এক রহস্যময় সন্ন্যাসীর কথা যাঁর সঙ্গে বিনয়বাবুর গতবার দেখা হয়েছিল কাঠমান্ডু থেকে একটু দূরে যখন ওঁরা দক্ষিণাকালী মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন। যিনি তাঁদের হাতে জবা ফুল দিয়েছিলেন এবং পুঁথির বিষয়ে সাবধান করেছিলেন। ইনিই কি সেই সন্ন্যাসী? কিন্তু কোথায় গেলেন তিনি? কালীর পিছন হরেন্দ্রনাথও সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছেন। ওঁদের বাইরে আসতে দেখে নদীর ধারে অপেক্ষারত মনীশও এগিয়ে এসেছে। কালীকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে সে প্রশ্ন করে কারোকে খুঁজছে কিনা। সন্ন্যাসীর কথা শুনে সেও অবাক হয়ে যায় ... বলে "আমি তো গেটের দিকে তাকিয়েই ছিলাম, কোন সাধুজিকে তো বাইরে আসতে দেখিনি" এঁদের মুখে সব শুনে সে বলে "এই পুণ্যভূমিতে কত সিদ্ধ মহাপুরুষ আসেন, আমরা সাধারণ মানুষ ওঁদের সহজে চিনতে পারি না। তবে উনি যখন নিজে থেকে আপনাদের দর্শন দিয়েছেন, তার মানে উনি সঙ্গে আছেন, ওনার কৃপাদৃষ্টি আছে আপনাদের ওপর ... কোন চিন্তা নেই ... জয় বাবা পশুপতিনাথ, জয় মা গুহ্যেশ্বরী।"

ওখান থেকে ফেরার সময় বাজারে গিয়ে পূজার সব উপকরণ কেনা হল। মনীশ সব জানে কোথায় কী পাওয়া যায়। বেশিরভাগ নেপালি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ হয়, পূজা অর্চনা কিছু বাদ যায় না কখনও। কাজেই 'মা রুদ্রচন্ডীর পূজো করা হবে অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য' এ কথা শুনে সে নিজে আগ্রহ

নিয়ে সমস্ত কিছু যোগাড় করল। ফেরার পথে হরেন্দ্রনাথ কালীকে বোঝাচ্ছিলেন বজ্রযানি বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে আমাদের পরিচিত তন্ত্রধর্মের অদ্ভুত মিলের কথা ... "পূর্ব আসামে অনেক জায়গায় পূজা হয় দেবী 'তীক্ষ্ণকান্তির'। তাঁর বর্ণনা আর দেবী একজটার বর্ণনা হুবহু একরকম। এই দেবীর ছয়জন সঙ্গিনীও আছেন ... সুভগা, বিকটা, ভীষণা, চামুণ্ডা ইত্যাদি। এনার পূজার উপকরণ হল কারনবারী, মোদক, নারকেল, আখ, মাছ ... একসময় এই দেবীকে তুষ্ট করার জন্য নরবলিও হত। অবশ্য বজ্রযানী বৌদ্ধ ধর্মে কীভাবে একজটা দেবীর পূজা হয় তা আমি ঠিক জানি না।

কালী গভীর আগ্রহে শুনছিল সব। বলল "সব তো মায়েরই রূপ"। হরেন্দ্রনাথ বললেন "হ্যাঁ তা ঠিক। এই দেবীকে উগ্রতারাও বলা হয় কোথাও কোথাও। তবে অবশ্য কালিকা পুরাণ আর তারাতন্ত্রে উগ্রতারার বর্ণনা এক নয়।"

কালী ভক্তিভরে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল "আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে আমরা সব মায়ের সন্তান। যে রূপেই পূজো করি সন্তান বিপদে পড়লে মা সাড়া না দিয়ে পারে না। উগ্র রূপ হোক আর যাই হোক মা আমার কল্যানময়ী।" হরেন্দ্রনাথ কালীর মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে বললেন "ঠিকই বলেছ তুমি। তোমার এই অচলা ভক্তি, বিশ্বাস ... এই তো মা চান।"

হোটেলে ফিরে ওঁরা কিছু খেয়ে নিয়ে মনাস্টারি রওয়ানা দিলেন। মনাস্টারিতে লামার একজন শিষ্য এসে অভ্যর্থনা করে ওঁদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। হরেন্দ্রনাথ রুদ্রচন্ডীর পূজো করবেন বলে মনাস্টারির ভিতর দিকে একটা প্রশস্ত ঘর পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। পুজোয় বসার জন্য হরেন্দ্রনাথ সব সাজাতে লাগলেন, কালী তাঁকে সাহায্য করছিল।

লামাও একজটার পুজোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তবে যে ঘরে দেবীমূর্তি আছে, যেখানে উনি পুজো করবেন, সেখানে আজ সবার প্রবেশ নিষেধ। সব কিছু লামা নিজের হাতেই করছেন।

হরেন্দ্রনাথ পুজোয় বসার আগে বিনয়বাবু আর প্রফেসর দাশগুপ্তকে বললেন "আপনারা হোটেলে ফিরে যেতে পারেন ইচ্ছা করলে। আমার পুজো সারা রাত ধরে চলবে এবং আমার ধারনা একজটা দেবীর পুজোও তাই। আমার আরও মনে হচ্ছে আজ রাতেই কিছু হবে।"

দুজনেই রাজি হলেন না এই প্রস্তাবে। বিনয়বাবু বললেন "তা কী করে হয়? অজান্তে পুঁথিটা কিনে বিপদ তো আমিই ডেকে এনেছি। আপনি অনুগ্রহ করে এসেছেন আমাকে সাহায্য করতে। লামাজিও তাই ... আর আমি আপনাদের ছেড়ে হোটেলে গিয়ে আরাম করব"?

হরেন্দ্রনাথ অল্প একটু হাসলেন — "সে আপনার অভিরুচি। তবে শুধু সারারাত জেগে থাকার জন্য আমি বলছি না। যে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আমাদের যুদ্ধ, সে যথেষ্ট শক্তিশালী ও নিষ্ঠুর। তার অশুভ অশরীরী শক্তি আহ্বান করার ক্ষমতার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। নিরাপত্তার খাতিরেও আপনাদের দূরে থাকতে বলছি।"

বিনয়বাবু ও প্রফেসর দাশগুপ্ত দুজনেই এখান থেকে যেতে রাজি হলেন না। প্রফেসর বললেন — "আমিও বিনয়ের সঙ্গে একমত। যদি বিপদের সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা স্বার্থপরের মত দূরে বসে থাকব এ তো সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার এই ঘটনার শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য কৌতূহল তো আছেই। আমার এই দীর্ঘ জীবনে কখনও কোন অলৌকিক ঘটনা চাক্ষুষ দেখিনি, শুনেছি মাত্র। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যখন সুযোগ পাচ্ছি তখন তা থেকে দূরে সরে থাকি কী করে?"

লামা একবার একটি পাত্র হাতে মনাস্টারির বাইরে এলেন। পাহারারত একজন পুলিশের লোককে বললেন ইন্সপেক্টর প্রধানকে ডেকে দিতে। প্রধান অনতিদূরেই একটি গাড়ির মধ্যে ছিলেন। সেখান থেকে ওয়াকি টকিতে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। লামার তলব শুনে তাড়াতাড়ি চলে এলেন। লামা হাতের পাত্র থেকে একটু জল নিয়ে ইন্সপেক্টরের গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দিলেন মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে। তারপর বললেন "আপনার সব সহকর্মীদেরও ডাকুন, ওদেরও সুরক্ষা প্রয়োজন।" এক এক করে সব পুলিশ কর্মচারীদের মাথায় জল ছিটিয়ে দিলেন লামা মন্ত্র পড়তে পড়তে। সবাই ভক্তিভরে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপূত জল নিয়ে লামাকে নমস্কার করে যে যার জায়গায় চলে গেল। শুধু আসতে পারল না যারা সাদা পোশাকে আছে, যেহেতু তারা পরিচয় গোপন করে আছে এবং চারপাশে নজর রাখছে।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় কখন হঠাৎ করে ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে তা বোঝা

মুশকিল। বিকাল পর্যন্ত আকাশ পরিষ্কার ছিল। সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে মেঘে ঢেকে গেল, সঙ্গে বৃষ্টি আর বজ্রপাত। তাপমাত্রা বেশ নেমে গেল আর হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। মনীশ ইন্সপেক্টর প্রধানের গাড়ির পাশেই তার গাড়ি রেখে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বলছিল। বৃষ্টি আসতে প্রধান তাকে নিজের গাড়িতে ডেকে নিলেন।



ওদিশের জ্ঞান ফিরল পরদিন সকালে। কিছুক্ষণ পরে গিয়ালপোর সঙ্গে তার দেখা হল। গিয়ালপো বললেন "কাল রাত্রে তুমি এখানকার প্রধান উপাসকদের পরিবারের একজন হয়েছ। এখন আমরা সবাই আত্মীয়। সবাই সবাইকে সাহায্য করবে তার সাধনায় আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই অন্তরঙ্গ চক্রে যা হবে, যা দেখবে, যা শিখবে তা বাইরের কারোর কাছে বলতে পারবে না ... এমনকি তোমার সঙ্গী ওই মিত্তাকেও না।" মিত্তার নাম যেন একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই করলেন গিয়ালপো। "কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাল রাত্রে তোমার গুহ্যমন্ত্রে দীক্ষা হয়নি তুমি সজ্ঞানে ছিলে না বলে। আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। তোমার দীক্ষা হবে আজ থেকে আট দিন পর, আমার গণনা অনুযায়ী ঐ দিন সবচেয়ে উপযুক্ত। একটু ইতস্তত করে তারপর গিয়ালপো বললেন "ব্রিগো দেশবাসী ওদিশ, এই প্রথম আমি একজন বিদেশি মানুষকে আমাদের ধর্মে দীক্ষা দেব, গোপন ক্রিয়াকলাপ শেখাব। কিন্তু তুমি যদি আমার শর্ত না মানো তাহলে তোমাকে আমি ধ্বংস করে দেব। তুমি ব্রিগোদেশে আমাদের ধর্ম প্রচার করবে এই জন্যই আমি তোমাকে শিষ্যত্ব দিয়েছি।"

ওদিশ বলল "আপনার শর্ত তো আমি মেনেই নিয়েছি।" গিয়ালপো বললেন—"ঠিক আছে। আপাতত তুমি দীক্ষার দিন আসা পর্যন্ত জ্ঞানী প্রকৃতি দেব দেবী 'ইউম', লা, সিপা আর টোনপা'র" আরাধনা করতে থাক। তাঁরা তোমাকে আরও শক্তিশালী করবেন।"

গিয়ালপো সেখান থেকে চলে যেতে যেতে ভাবছিলেন "এই উদ্ধত ও ক্ষমতালোভী বিদেশি যুবককে গুপ্তবিদ্যা শেখানো ঠিক হবে তো? তাঁদের ধর্মে প্রকৃতি দেবদেবীর আরাধনা, আবাহন প্রক্রিয়া রপ্ত করে তবেই নিম্নস্তরের

শক্তির সাধনা করতে হয়। ক্ষমতালিপ্সু মানুষেরা শুধু নিম্নস্তরের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা শিখে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে। মানুষের উপকারের বদলে ক্ষতি করে। এই যুবকেরও তো শুভশক্তির আরাধনায় বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। শুধু তার অনৈসর্গিক ক্ষমতা চাই। তিনি একটু দ্বিধার সঙ্গে রাজি হয়েছেন শুধু তাঁর ধর্ম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে এই লোভে। দেশ বিদেশ ঘুরে তিনি বিভিন্ন ধর্মের সম্বন্ধে জানেন, কীভাবে সেই সব ধর্ম ছড়িয়ে পড়ছে, জনপ্রিয় হচ্ছে, তাও খবর রাখেন। পার্থিব অগ্নি উপাসক 'মাজদাইয়াসনা' ধর্ম, গ্রিকদের ধর্ম, মিথ্র উপাসনা, তাঁদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যে উর্বর ও উন্নত দেশ আছে, সেখানকার ধর্ম ঐ ইন্দো নামক পথপ্রদর্শটিরও ধর্ম ... এইসব ধর্ম যেভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে তাঁর ধর্ম হয়তো একসময় এই ঝাংঝুং এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। এছাড়া সুদূর দক্ষিণ পূর্বে মগধ নামে যে শক্তিশালী দেশ আছে, যার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে মহাবীর আলেকজান্দর পর্যন্ত সাহস পাননি, সে দেশ থেকে নাকি এক ধর্ম দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না, কোন দেবদেবীর পূজা করে না, ধর্মানুষ্ঠান, যজ্ঞ কিছুই করে না ... শুধু নির্বাণ লাভের জন্য সাধনা করে।

এইসব শুনে অনেক চিন্তা ভাবনা করে ওদিশকে গুপ্তবিদ্যা শেখাতে রাজি হয়েছেন গিয়ালপো। মাতা 'ইউম' জানেন তাঁর উদ্দেশ্য শুধু বন ধর্মের প্রচার।" একটি চিন্তিতভাবে মনে মনে প্রার্থনা মন্ত্র 'ওম মাত্রিমুয়ে সালেদু' জপ করতে করতে চলে গেলেন গিয়ালপো।

ওদিশ মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করল না। ধৈর্য ধরা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। এই সবে ছমাস কেটেছে। আরও কতদিন লাগে ঐ শক্তি আয়ত্ত করতে কে জানে? অন্য শিষ্যদের মুখে শুনেছে যে প্রাথমিক পর্যায়ের সাধনা সম্পূর্ণ করতে বহু বছর লাগে। নির্জনে বসে সাধনা করতে হয় প্রকৃতির। তখন তাদের কিছু কিছু শক্তি আয়ত্ত হয়, যা আসে প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে একাত্মবোধ থেকে। তারপরই তারা প্রেতলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা শেখে। শুভ শক্তির আরাধনা আয়ত্ত করে তবেই নিম্নস্তরের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা শেখে। তখন সেই শক্তি অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে না। ওদিশের অত ধৈর্য নেই। শুভ অশুভ নিয়ে মাথাব্যথাও

নেই। তার প্রয়োজন শুধু অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করা। তাই দিয়েই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

ওদিশের গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে গিয়ালপোর অন্য শিষ্যদের মধ্যেও চাপা অসন্তোষ ছিল। শুভ শক্তির আবাহন আয়ত্ত না করেই এই বিদেশী, অপদেবতাদের নিয়ন্ত্রণ করার বিদ্যা শিখবে, এ তো তাদের পবিত্র ধর্মের নিয়মের ব্যতিক্রম। উপাসক যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখছে, যতক্ষণ না তার ক্রোধ, কাম, লোভ এবং সর্বোপরি অহঙ্কারকে জয় করতে পারছে, ততক্ষণ এই বিদ্যার অধিকার তার জন্মায় না। অনধিকারী ব্যক্তির হাতে এই গুপ্ত বিদ্যার অপব্যবহার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। কিন্তু গিয়ালপো যা ঠিক করেছেন সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন তোলা শিষ্যদের কাছে অকল্পনীয়। তাই তাদের মনের ভাব চাপাই থাকে। তীক্ষ্নবুদ্ধি গিয়ালপো যে শিষ্যদের অসন্তোষ অনুমান করতে পারেননি তা নয়, কিন্তু তিনি যা করছেন অনেক চিন্তা ভাবনা করেই করেছেন। বন ধর্মের প্রচার না হলে একদিন হয়তো হারিয়ে যাবে, তাই এই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত।

গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার পর যেসব আচার ওদিশের বিতৃষ্ণার উদ্রেক করত, ধীরে ধীরে সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। বলির পশুর রক্ত পানে এখন তার বমনেচ্ছা হয় না। অপদেবতার আবাহনে মনঃসংযোগ করতেও অসুবিধা হয় না। কিন্তু দু-বছর পার হবার পরেও সে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখেনি বলে মনে মনে অধৈর্য বোধ করছে। মাঝে মাঝেই গিয়ালপোকে সে প্রশ্ন করে কবে তার করায়ত্ত হবে সেই বহুপ্রতিক্ষিত বিশেষ ক্ষমতা যার দ্বারা অপদেবতাদের সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। প্রতিবারই গিয়ালপো স্পষ্ট ভাষায় বলেন "সাধনা চালিয়ে যাও। কোন অনৈসর্গিক ক্ষমতাই সহজলভ্য নয়"। একদিন ওদিশ গিয়ালপোর কাছে এক প্রস্তাব রাখল ... তাকে যে সমস্ত মন্ত্র এবং আচারবিধি শেখানো হচ্ছে তা লিপিবদ্ধ করা হোক, যাতে সে যখন নিজের দেশে ফিরে যাবে ভবিষ্যত প্রজন্মেরও এই ধর্ম শিখতে কোন অসুবিধা না হয়।

গিয়ালপো প্রথমেই এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তাঁদের ধর্মে মন্ত্র, আচারবিধি, দেবতাদের আহ্বানের নিয়মাবলী এসব লিখে রাখার প্রথা নেই। সব কিছু গুরুশিষ্য পরম্পরায় শেখানো হয়। সমস্ত কিছু স্মৃতির মধ্যে ধরে

রাখা উপাসকদের প্রথম কর্তব্য। তাছাড়া লিপিকার কোথায়? তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন শিল্পী ও লিপিকার, শুধু সেই লিখতে পারে। কিন্তু সে তার নিজের সাধনা ছাড়া তাঁদের উপাসনাগৃহের অলঙ্করণ, চিত্রপট আঁকা এইসব কাজে সবসময়ই ব্যস্ত থাকে।

ওদিশ সহজে দমে যাবার পাত্র নয়। সে প্রস্তাব দিল মিত্তা তো সঙ্গেই আছেন। তিনি দক্ষ লিপিকার, তবে ব্রিগো দেশের লিপিই লিখতে পারেন তিনি। গিয়ালপো অনুমতি দিলে মিত্তা সবকিছু ব্রিগো লিপিতে তাদের সঙ্গে আনা পার্চমেন্টে সুন্দর করে লিখে নিতে পারেন। মিত্তার তো বিশেষ কোন কাজ নেই এখানে দেবী কুবেলির ধ্যান করা ছাড়া। এরমধ্যে তিনি স্থানীয় ভাষা ভালোই শিখে নিয়েছেন ... ভালোই বলতে পারেন এখন।

গিয়ালপো এ প্রস্তাব কানেই তুললেন না। একজন অদীক্ষিত, অন্য ধর্মের পূজারী কানে শুনবে তাঁদের পরম পবিত্র গুপ্ত মন্ত্র, শুধু তাই নয় সে এক বিদেশি ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে? এ অসম্ভব। ওদিশকে একটু রাগতভাবেই বললেন গিয়ালপো "এতদিন শিক্ষা নেওয়ার পর এরকম মূর্খের মতো প্রস্তাব কী করে করলে তুমি? ওদিশের বহু অনুনয় বিনয়েও নরম হলেন না গিয়ালপো। তখন সে নতুন প্রস্তাব দিল, শিষ্যদের মধ্যে যে লিপিকার, সেই লিখে দিক। তার বদলে বর্তমান মন্দিরের পাশে নুতন উপাসনাগৃহ তৈরির জন্য যত স্বর্ণমুদ্রা লাগে তা দেবে ওদিশ। অনেক তর্ক বিতর্কের পর গিয়ালপো রাজি হলেন এক শর্তে। সমস্ত পূজাবিধি ও মন্ত্র, দুটি আলাদা আলাদা পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হবে। চার মূল দেবদেবী, যাঁরা শুভশক্তির নিয়ন্ত্রক, তাদের পূজার সমস্ত নিয়মাবলীর মন্ত্র একটি আলাদা পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, কারণ যেকোন উপাসকের সেগুলি আগে আয়ত্ত করা অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয় পুঁথিতে থাকবে অপদেবতাদের আবাহন ও নিয়ন্ত্রণ করার উপায়। ওদিশ এক কথায় রাজি হল। তার দ্বিতীয় পুঁথিতেই প্রয়োজন। বৃষ্টি নামানো বা ফসল ফলানোর মন্ত্র তার না শিখলেও চলবে। এখন ওদিশ এখানকার লিপি পড়তে শিখে নিয়েছে নিজের আগ্রহে। তাই মন্ত্র ব্রিগোভাষাতে লেখা না হলেও অসুবিধা নেই।

লিপিকার প্রথম পুঁথি শেষ করতে প্রায় সাত মাস কাটিয়ে দিল। ইতিমধ্যে ওদিশ এই ধর্মের বিষয়ে কিছু কিছু কথা মিত্তাকে জানিয়েছে। রক্তপানের কথা

শুনে মিত্তা বিতৃষ্ণায় মুখ বিকৃত করেছেন। তাঁর মনের মধ্যে এখনও প্রচুর দ্বিধা আর সন্দেহ ... ওদিশ যা করছে ঠিক করছে তো?

চতুর্থ বছরের শেষে ওদিশের প্রথম অলৌকিক অভিজ্ঞতা হল। দ্বিতীয় পুঁথি লেখা সবে শেষ হয়েছে। সে রাত্রে মাটির নিচের ঘরে ওরা সবাই সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করছে আর বলির রক্ত আহুতি দিচ্ছে অগ্নিকুন্ডে, ঘর ভরে আছে ধোঁয়ায় ... ওদিশের মনে হল আগুনের শিখার ওপর ধোঁয়ার মধ্যে কিছু যেন ধীরে ধীরে আকৃতি নিচ্ছে। মন্ত্রোচ্চারণের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি এক বিশাল আকার ধারণ করল ... কিন্তু কি ভয়ঙ্কর তার রূপ ... জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো দুটো চোখ যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। এতদিনের মানসিক প্রস্তুতির পরেও ওদিশের বুক কেঁপে উঠল। সম্বিত ফিরতে দেখল গিয়ালপো ছাড়া সবাই মাথা নিচু করে আছে ... শুধু গিয়ালপো দাঁড়িয়ে মন্ত্র বলে চলেছেন। আহুতি শেষ হবার পর গিয়ালপো মন্ত্র পাঠ বন্ধ করলেন ... ওই ভয়ালদর্শন মূর্তি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন গিয়ালপো বললেন—"যাকে দেখলে সে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অধিবাসী নয়। এদের বুদ্ধিবৃত্তি খুব উন্নত স্তরের নয়, প্রকৃতিও অত্যন্ত হিংস্র। এরকম আরও আছে ... তুমি আবাহন করার পদ্ধতি আয়ত্ত করলে, কিন্তু যদি তাকে তোমার বশীভূত না করতে পারো তাহলে তোমার প্রাণসংশয় হতে পারে।"

ওদিশ পরদিন মিত্তাকে তার অভিজ্ঞতার কথা না বলে পারল না। মিত্তা শুনতে শুনতে অনেকবার মাতা কুবেলির নাম নিলেন। মনে মনে মিত্তা বুঝলেন দ্বিতীয় পুঁথিতেই আছে ঐ ভয়ঙ্করদের পৃথিবীতে ডেকে আনার উপায়। তাঁর মতে, এটি অত্যন্ত অশুভ একটি গ্রন্থ। প্রথমটির, তিনি যা বুঝেছেন, তাঁর নিজের ধর্মের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে ... মানুষের কল্যাণ কামনায় উপাসনার পন্থা। কিন্তু তিনি জানেন দ্বিতীয়টির ওপরই ওদিশের সব আগ্রহ কেন্দ্রীভূত। তিনি ঠিক করলেন, দ্বিতীয় পুঁথিটির ধারে ধারে মাতা কুবেলির প্রার্থনা মন্ত্র লিখবেন নিজের ভাষায়। যদি তাতে এই অশুভ পুঁথির অকল্যাণকর প্রভাব কিছু খর্ব করা যায়।



ঝড়বৃষ্টি নামবে সন্ধ্যার সময় এ কথা জানা ছিল দোরজের। সেও তৈরি হচ্ছে তার কার্যসিদ্ধির জন্য। এই বৃষ্টির জন্য তার সুবিধাই হল। পুলিশের যে সব চর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এই ঝড়বৃষ্টির জন্য তাদের অসুবিধাই হবে। ইতিমধ্যে সে তৈরি হচ্ছে তিন শক্তিশালী অপদেবতাকে আহ্বান করার জন্য। পুঁথিটা না থাকায় তার একটু অসুবিধা হবে। তবে এত বছর ধরে প্রেতচর্চা করছে ঐ পুঁথির সাহায্যে, তাই মন্ত্র সব তার কণ্ঠস্থ। তবু পুঁথিটা সঙ্গে থাকলে তার আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি থাকে। এখনও তার একান্ন বলি সম্পূর্ণ হয়নি। তাই ঐ অপদেবতারা তার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নয়। আবাহন করে নিয়ে আসার পর তারা যে সবসময়ই তার ইচ্ছে মতো কাজ করবে সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। কিন্তু তাকে সেই ঝুঁকি নিতে হবে। ঐ পবিত্র পুঁথি অন্য কারোর কাছে থাকতে দেওয়া যায় না। আজ রাত বারোটার সময় নরবলি দিয়ে প্রেতদের তুষ্ট করে দোরজে কার্যসিদ্ধি করবে। দোরজের সহকারী স্থানীয় ভক্তরা নরবলির কথা জানে না। তবে যারা বাচ্চা ছেলেটিকে আনার কাজে সহায়তা করেছে তারা কিছুটা আন্দাজ করেছে। কিন্তু তারা দোরজেকে এত ভয় পায়, নরবলিতে তাদের মন সায় না দিলেও আপত্তি জানাবার সাহস কারও নেই। দোরজের কাছে মাঝে মাঝে দুজনকে দেখা যায় তাদের মুখের দিকে তাকালেই এদের ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। মুস্তাং অঞ্চলের লোকজনদের মতো পোষাক, খর্বাকৃতি লোক দুটোকে দূর থেকে দেখলে তাদের কোন বিশেষত্ব আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ওদের দৃঢ় বিশ্বাস এ দুজন মানুষ নয়। ওদের মুখ দেখলে এদের মনে হয় ... প্রাণহীন মৃত মানুষের মুখ। তারা কখন কোথা থেকে হঠাৎ দোরজের কাছে আসে, কখন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় এরা বুঝতে পারে না। কানাঘুষো শুনেছে দুজন সাহেব এদের অনেকগুলো গুলি করেছিল, কিন্তু ঐ লোক দুজনের কিছুই হয়নি, একফোঁটা রক্তও ওদের শরীর থেকে বার হয়নি। একজন নাকি তালাবন্ধ জেলখানার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এসব কি মানুষ পারে? ওদের অনুমান ভুল নয়। এ দুজন একসময় দোরজের শিষ্য ছিল। কয়েক বছর আগে ওদের মৃত্যু হয়। কিন্তু ওদের দিয়ে দোরজে এখনও নিজের অনেক কাজ করিয়ে নেয়। যে দুজন শিষ্য উইলিয়ামের মনাস্টারিতে আগুন লাগানোর জন্য পুড়ে মারা যায় তাদেরও কাজে লাগাতে পারতো, কিন্তু তাদের শরীর এত সাংঘাতিকভাবে পুড়ে যায় যে তাদের কোন

কাজে লাগানো অসম্ভব ছিল।

এই দুজন শরীরি প্রেত এই ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারের সুযোগে মনীশ আর ইন্সপেক্টরের গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টর প্রধানের দলের একজন কনস্টেবলের চোখে পড়ল একটা ছোট পুরনো ধরনের বাড়িতে অনেক মানুষের আনাগোনা। বৃষ্টি শুরু হবার পরেও কিছু লোক ভিজতে ভিজতে আসছে। সে আর একজন সঙ্গীকে নিয়ে সরেজমিনে দেখার জন্য সেই বাড়ির দরজায় টোকা দিল। বেশ কিছুক্ষণ দরজায় ধাক্কা দেওয়া, ডাকাডাকি করার পর একজন লোক এসে দরজা খুলল। সামনে দুজন পুলিশ দেখে তার মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল, তাড়াতাড়ি এদের মুখের ওপরই দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ততক্ষণে এরা জোর করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। উপায়ান্তর না দেখে লোকটা দোরজে এবং অন্যদের সাবধান করার জন্য চিৎকার শুরু করে। তখন প্রথম কনস্টেবলটি বুদ্ধি করে দ্বিতীয়জনকে বলে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ইন্সপেক্টর প্রধানকে খবর দিতে। দ্বিতীয়জন তাই করে, যাবার সময় যে লোকটা দরজা খুলেছিল, তাকেও ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়।

দোরজে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এই বাধা পেয়ে। বলির সময় এখনও আসেনি। আবারও কি বলি সম্পূর্ণ হবে না? অপদেবতাদের সে একবার অভুক্ত ফিরিয়ে দিয়েছে, আবার যদি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে ভয়ঙ্কর কান্ড ঘটতে পারে। তাদের ওপর ওর নিজের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যাবে। সে তার অনুচর আর ভক্তদের বলে যে করেই হোক ওই পুলিশটাকে আটকাও ... দরকার হলে মেরে ফেল। ওর পিছনে আরও পুলিশ আসবে ... কিছুক্ষণের জন্য তাদের ঠেকিয়ে রাখতেই হবে। ও এখনই প্রেতলোকের অধিবাসীদের আহ্বান শুরু করবে। একবার তারা এসে গেলে কোন পুলিশের সাধ্য নেই তাকে আটকায়।

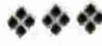
ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কনস্টেবলটি আর একজন কনস্টেবলের কাছে তার বন্দিকে হস্তান্তর করে ওয়াকি টকিতে ইন্সপেক্টর প্রধানকে সব জানিয়ে দিয়েছে। ওয়াকি টকির মাধ্যমে অন্যরাও খবর পেয়ে সবাই দোরজে ও তার দলবল যে বাড়িটায় আছে সে দিকে যাচ্ছে। ইন্সপেক্টর প্রধান বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন, মনীশও নামল। এগোতে গিয়ে আবছা অন্ধকারে

সামনে দুই ছায়ামূর্তি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায় দুজনে। বৃষ্টি আর অন্ধকারের জন্য দুই আগন্তুকের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দুজন তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে। ইন্সপেক্টর পিস্তল বার করে চেঁচিয়ে দুজনকে রাস্তা ছেড়ে দিতে বললেন। তারা কিছু শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। এদিকে বৃষ্টির বেগ বেড়ে চলেছে আর ঠিক সেই সময় ... কাঠমাণ্ডুতে যা মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে, রাস্তার আলোগুলো নিভে গিয়ে চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। ইন্সপেক্টরের কাছে একটা ছোট টর্চ ছিল ... রেনকোটের পকেট থেকে বার করতে একটু সময় লাগল ... টর্চ জ্বালতে মনে হল ছায়ামূর্তিরা আরও কিছুটা এগিয়ে এসেছে টর্চের আলোয় দুজনের হাতের উদ্যত কুকরি ঝলসে উঠল।

হঠাৎ মনীশ আর ইন্সপেক্টরের নাকে এল এক পচা দুর্গন্ধ। ইন্সপেক্টরের কাছে এ গন্ধ খুব পরিচিত ... বহুবার এই গন্ধ পেয়েছেন মর্গে ... অনেক দিনের পুরনো মৃত মানুষের শরীরের গন্ধ। থমকে গিয়ে টর্চ ফেললেন এবার ওদের মুখে। মনীশের ভীতকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল ... এরা কি মানুষ? এরকম বিভৎস মুখ কি কোন জীবিত মানুষের হতে পারে?

দেরী না করে গুলি চালালেন ইন্সপেক্টর। দশ মিটার দূরত্ব থেকে তাঁর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা নেই ... তবুও দুজনের কিছু হয়েছে বলে মনে হল না। তারা এগিয়েই আসতে লাগল। আবারও গুলি করলেন ইন্সপেক্টর ... ওরা এত কাছে এসে গেছে যে গুলি শরীরে লাগার শব্দ শোনা গেল। হঠাৎ ওরা থেমে গেল ... যেন এগোনোর চেষ্টা করছে, তবু কিছুতে বাধা পেয়ে যেন এগোতে পারছে না। এক অদৃশ্য দেওয়াল আটকে দিচ্ছে ঐ শরীরি প্রেতদের। লামার দেওয়া মন্ত্রপূত জল? টর্চের আলো এক মুহূর্তের জন্য নিভিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর ... পরমুহূর্তেই আলো জ্বেলে আর ওদের দেখতে পেলেন না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে দুজন।

এই সময়ে দূর থেকে কোলাহলের শব্দ কানে এল। ওয়াকি টকিতে দোরজের ডেরা যেদিকে বলে খবর পেয়েছিলেন সেদিন থেকে আসছে না অনেক লোকের কণ্ঠস্বর? দৌড়লেন ইন্সপেক্টর প্রধান ... পিছনে পিছনে ভীত সন্ত্রস্ত মনীশ।



দুটো পুঁথিই লেখা শেষ হবার পর আনুষ্ঠানিকভাবে গিয়ালপো ওদিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। পুঁথির সব মন্ত্র তাঁর নিজের কণ্ঠস্থ, তবে ওদিশের প্রয়োজন হবে এই পুঁথি দুটির। কিন্তু সমস্যা হল ওদিশের শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার সে অপদেবতাদের আবির্ভাব নিজে প্রত্যক্ষ করেছে। সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে সে যোগ দিয়েছে, তার মন্ত্রোচ্চারণও এখন যথেষ্ট শুদ্ধ। মনসংযোগ করতে তার অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার পক্ষে এককভাবে কোন শক্তিকে আহ্বান করা এখনও সম্ভব হয়নি। গিয়ালপো ঠিক করলেন, এবার তার পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। ওদিশ ও মিত্তার এ দেশে আসার পর কেটে গেছে চার বছর সাত মাস। মিত্তা যেন একটু তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর একদা বলিষ্ঠ শরীর যেন এখন বয়সের ভাবে অনেকটাই ন্যুব্জ। শুধু কি বয়সের ভারে? যতদিন যাচ্ছে তাঁর মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ দৃঢ় ভাবে বাসা বাঁধছে। ওদিশের এই অদ্ভুত অভিযানে তাঁর রাজি হওয়া উচিত হয়নি। প্রথমেই শক্ত হয়ে এর বিরোধিতা করা যেত ... হয়তো ওদিশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করা যেত। গিয়ালপো তাঁর সঙ্গে খুব একটা বাক্যালাপ করেন না, ধর্ম নিয়ে আলোচনা তো একেবারেই না। তাঁর কাছে মিত্তা বিধর্মী, এবং গিয়ালপো জানেন অন্য সব ধর্মই তাঁর বন ধর্মের তুলনায় নিকৃষ্ট।

খুব গোপনে মিত্তা তাঁদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দ্বিতীয় পুঁথিতে একটু একটু করে ব্রিগো ভাষায় দেবী কুবেলির প্রার্থনা মন্ত্র লিখতে আরম্ভ করলেন। ওদিশ জানলেও আপত্তি করেনি। সে কখনও কুবেলির উপাসকদের কোন কিছু অলৌকিক করতে দেখেনি, আর এখানে শূন্য থেকে ভয়ঙ্কর সব অপদেবতাদের দৃশ্যমান হতে দেখেছে সে নিজের চোখে। তাই কুবেলির মন্ত্র পাশে পাশে লেখা থাকলে পুঁথির আসল মন্ত্রের শক্তি কমে যাবে এমনটা সে মনে করে না। তাই ভেবেছে কুবেলির মন্ত্র লিখে যদি মিত্তা শান্তি পান তাতে তার কিছু এসে যায় না।

পরীক্ষার জন্য এক বিশেষ দিন বাছলেন গিয়ালপো গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে। কিন্তু তাঁর মনে একটা দ্বিধা আছে। ভবিষ্যত বিচার করে তিনি কিছু

অশুভ ইঙ্গিত পাচ্ছেন। কিন্তু সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না কী হবে। ওদিশকে বললেন "তোমাকে এই আবাহন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় করতে হবে। আমি এবং অন্যেরা উপস্থিত থাকব, কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করব না। তবে তোমার কাজ সহজ হবে একটি মানুষকে বলি দিতে পারলে। এ কাজ আমরা সচরাচর করি না, পশুবলি দিয়ে তার রক্ত আহুতি দিই। কিন্তু তুমি অধৈর্য হয়ে উঠছ শিক্ষা সম্পূর্ণ করে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য। তাই আমি এই উপায়ের কথা বললাম। কিন্তু বলির জন্য মানুষ খুঁজে বার করা সহজ হবে না।"

ওদিশের সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও লাগল না "কোন অসুবিধা নেই। আমাদের সাথে যে দাসটি আছে তাকে বলি দেওয়া যেতে পারে" বহু বলিতে অংশ নেওয়া সত্ত্বেও গিয়ালপো হতচকিত হলেন ওদিশের নিস্পৃত নিষ্ঠুরতা দেখে। গত কয়েক বছর ধরে এই ভৃত্যটি ছায়ার মতো ওদিশ আর মিত্তার সঙ্গে থাকে, ওদের সেবা করে, ওদের উচ্ছিষ্ট খায়। রাত্রে এঁরা ঘুমিয়ে পড়লে ও বাইরে যে পশুশালায় পশুরা থাকে তার একপাশে নিজে শুতে যায় কারণ এঁদের বাসস্থানের মধ্যে তার রাত্রিবাস করার অধিকার নেই। গিয়ালপো জানেন মিত্তা ভৃত্যটিকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। ওদিশ এক কথায় তাকে বলি দেবার সিদ্ধান্ত নিল? মিত্তা কি রাজি হবেন? ওদিশ বলল "মিত্তাকে জানাবার প্রয়োজন নেই। উনি বৃদ্ধ হয়েছেন, এ সব শুনলে সহ্য করতে পারবেন না। যে রাত্রে বলি হবে আমি ওই দাসটাকে মাদক খাইয়ে অচেতন করে দেব। রাত্রে আমাদের আবাহন যখন শুরু হবে মিত্তা তখন গভীর নিদ্রায় থাকবেন। চাইলে কী আমি মিত্তার খাবারেও মাদক মিশিয়ে দিতে পারি, যাতে উনি কিছু জানতে না পারেন।"

গিয়ালপো কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর মনের এক কোণে যে এক অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কা বাসা বেঁধেছে তা ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে। কিন্তু ভবিষ্যত দ্রষ্টা গিয়ালপো কেন বুঝতে পারছেন না কি হবে? তবে কি প্রধান উপাস্য দেবতারা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট, তিনি পবিত্র নিয়ম ভেঙে ওদিশের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই তাকে অপশক্তির আবাহনের উপায় শেখাচ্ছেন বলে?

বলির জন্য নির্দিষ্ট রাতে কৌশলে তার উচ্ছিষ্ট খাবারে মাদক মিশিয়ে দিল

ওদিশ। গভীর রাত্রে তাকে তুলে এনে মাটির নিচের ঘরে যখন তাকে বলির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে, আশ্চর্যভাবে তার জ্ঞান ফিরে এল। সে নির্বোধ ছিল না, চোখ খুলে পারিপার্শ্বিক আর ওদিশের হাতে উদ্যত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দেখে বুঝতে পারল কী হতে চলেছে। তার হাত পা শক্ত করে বাঁধা, কাজেই তার কিছু করার ছিল না। এক অদ্ভুত চোখে ওদিশের দিকে তাকিয়ে সে পরিষ্কার কণ্ঠে বলল "তুমি মানুষ হয়েও অমানুষের মতো আচরণ করছ। তোমার ভালো হবে না ... তুমি আর মানুষ থাকবে না, ভয়ঙ্কর এবং ঘৃণিত পশুতে পরিণত হবে তুমি।" ওদিশের হাতের অস্ত্র তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আমূল বিদ্ধ হতে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।



যেদিক থেকে কোলাহল শোনা যাচ্ছিল সেদিকে দৌড়ে যেতে যেতে ইন্সপেক্টর পিছনে ঘুরে মনীশকে বললেন মনাস্টারিতে যেতে। দোরজের দলবলের সঙ্গে সংঘাত বিপজ্জনক হবে নিশ্চিত, সেখানে মনীশ কেন তার জীবন বিপন্ন করবে? মনীশ রাজি হয়ে মনাস্টারির দিকে চলে গেল। দোরজের আস্তানার সামনে তখন একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। দোরজের স্থানীয় ভক্তরা প্রাণপণ বাধা দিচ্ছে পুলিশের লোকরা যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে। যে সাহসী কনস্টেবলটি একা ঢুকে পড়েছিল সে সঙ্গে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও গুলি চালাতে ইতস্তত করে উপরওয়ালার অনুমতি না নিয়ে। সেই কয়েক মুহূর্তের দ্বিধার জন্য সে বাড়ির ভিতরের লোকজনের হাতে বন্দি হয়ে পড়ে। তারা তাকে নিরস্ত্র করে বেঁধে রাখে এক কোণে। দোরজের নির্দেশ মতো মেরে ফেলার সাহস তাদের ছিল না, কারণ তাহলে নেপাল পুলিশের হাত থেকে দোরজে তাদের বাঁচাবে কিনা সে সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত নয়। এদিকে যে লোকটাকে ধরে এনেছিল অপর কনস্টেবলটি সে অল্প সময়ের মধ্যেই মুখ খুলছে ... তার মুখেই জানা গেছে দোরজে ওই বাড়ির মধ্যে নরবলির প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইন্সপেক্টর প্রধান ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন। নরবলির কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তাঁর ঊর্ধতন অফিসারকে ফোন করে সব জানাতে তিনি নির্দেশ দিলেন যেন তেন প্রকারেণ নরবলি আটকাতে হবে। যদি গুলি চালাতে হয় তারও অনুমতি দিলেন তিনি। শূন্যে কয়েকটি গুলি ছুঁড়তেই দোরজের

দলবলের যারা বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে পুলিশকে বাধা দিচ্ছিল তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কিছু লোক পালিয়ে গেল, বাকিরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ইতিমধ্যে দোরজে তার মন্ত্র পাঠ, আবাহন শুরু করে দিয়েছে দোতলার একটি ঘরে। সে ঘরে ভক্তদেরও প্রবেশ নিষেধ। শুধু আছে তার একজন শিষ্য, আর সেই হতভাগ্য অনাথ ছেলেটি, যাকে বলির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে তাকে কড়া কোন মাদক খাইয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা আছে। ঘরের এক কোণে শুয়ে আছে সে, কোন নড়াচড়াও করছে না।

কিন্তু বাইরে থেকে গোলমালের আওয়াজ দোরজের কানে আসছে। সেজন্য আজ তার মনঃসংযোগে সময় লাগছে। একসময় মন্ত্রোচ্চারণ থামিয়ে ক্রুদ্ধভাবে শিষ্যকে বলল কী হচ্ছে দেখে আসতে। কাঠমান্ডুর এই অপদার্থ লোকগুলো কয়েকটা পুলিশকে ঘণ্টাখানেক আটকে রাখতে পারছে না? শিষ্য ফিরে এসে যা বলল তা শুনে তার কপালে ভাঁজ পড়ল চিন্তার। কয়েকটি নয়, বাইরে প্রচুর পুলিশ, সবাই সশস্ত্র এবং তারা বাড়ি ঘিরে রেখেছে। যে কোন সময় সামনের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে পারে তাঁরা ... দরজায় ধাক্কার আওয়াজ ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছে। স্থানীয় ভক্তদের ওপর ভরসা করে বসে থাকলে চলবে না, অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

মনাস্টারিতে একটা ঘরে রুদ্রচন্ডীর পুজো শুরু করেছেন হরেন্দ্রনাথ। পিছনে বসে আছেন বিনয়বাবু ও প্রফেসর। কালী এতক্ষণ পুজোর জোগাড়যন্ত্রে সাহায্য করছিল হরেন্দ্রনাথকে। এখন চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ্ হয়ে বসে আছে। লামা, দেবী একজটার পুজো শুরু করেছেন অন্য একটি ঘরে। ঘরের বাইরে সব শিষ্যরা নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। শুধু দুজন ক্রমাগত ধর্মচক্র ঘুরিয়ে চলেছে। আজ তারা মুখে কেউ 'ওম মনিপদ্মে হুম' বলছে না, কিন্তু মনে মনে সবাই জপ করে চলেছে।

ইন্সপেক্টর প্রধান কনস্টেবলদের বললেন দরজা ভেঙে ফেলতে। আর দেরি করা উচিত হবে না। দুজন বলিষ্ঠ কনস্টেবলের চেষ্টায় দরজার ভিতরের দিকের ছিটকিনি ভেঙে দরজা খুলে গেল। প্রধান আশা করেছিলেন ভিতরে দোরজের দলবল তাঁদের বাধা দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু দরজার ভিতরে দেখা গেল গাঢ় অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

বাইরের রাস্তার আলোও যেন ঐ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে ঢুকতে পারছে না। প্রধান ও আর একজন টর্চ জ্বালিয়ে আলো ফেললেন ভিতরে।

প্রথমে কিছু বোঝা না গেলেও কয়েক মুহূর্ত পরে মেঝের থেকে অন্তত ছ-সাত ফুট উঁচুতে দুটো লাল চোখ টর্চের আলোয় ঝলক দিল ... তার সঙ্গে একটা তীব্র আওয়াজ ... হিস্ স্ স্ স্ ...। অন্ধকারে একটু চোখ সয়ে গেছে ততক্ষণে ... প্রধান দেখলেন এক বিশাল আকৃতির সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সাপ কি এত বড় হয়? হলিউডের ছবিতে আনাকোন্ডা দেখেছিলেন প্রধান। এ তো তার থেকেও বড় ... ফণা তুলে তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। একটি নতুন ছেলে, সবে দু-মাস আগে কনস্টেবলের চাকরিতে যোগ দিয়েছে, সাহস করে উঁকি দিল ঘরের ভিতরে। তারপর প্রধানকে বলল "স্যার আমার মনে হচ্ছে এ গণ-সম্মোহন, মাস হিপ্নোটিজমের ব্যাপার। ছেলেটি লেখাপড়া জানে, নেপাল যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য ছিল। প্রধান তাকে কিছু বললেন না। তিনি একে হিপনোটিজম বলে কি করে ভাববেন? তিনি তো নিজের চোখে মনীশের বাবার মৃতদেহ দেখেছেন, দেখেছেন কি বিভৎসভাবে আমেরিকান সৈনিকটির মৃত্যু হয়েছে ... একটু আগে যে দুজনকে গলির মধ্যে দেখেছেন ... এসব তো মনের ভুল নয়।

তবু পিস্তল বার করে দুবার গুলি চালালেন ঐ মহাসর্পকে লক্ষ্য করে। কিছুই হল না তার। ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল ঘরের ভিতর থেকে। একটু পিছিয়ে এলেন প্রধান। বাইরে তখন বৃষ্টি থামার পর ঝোড়ো হাওয়া চলছে। হঠাৎ তাপমাত্রা কমে গিয়ে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে সবার।

হঠাৎ ধ্যান ভেঙে উঠে পড়ল কালী ... ঘোর লাগা চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল "এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে ... নয়তো বাচ্চাটাকে বাঁচানো যাবে না" হতবুদ্ধি হয়ে বিনয়বাবু প্রশ্ন করলেন "কোথায় যাবি তুই? কোন বাচ্চা?" সে কথা কালীর কানে গেল কিনা বোঝা গেল না ... ঘর থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল। বিনয়বাবু গেলেন পিছনে পিছনে। প্রফেসরও উঠেছিলেন, চোখের ঈশারায় বিনয়বাবু তাঁকে এখানেই থাকতে বললেন। এ সবরে মধ্যে হরেন্দ্রনাথ কিন্তু ঘুরেও দেখেননি কী হচ্ছে ... তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ পুজোর ওপর। কালী ছুটতে ছুটতে মনাস্টারি থেকে বেরিয়ে যেতে বিনয়বাবু তাকে অনুসরণ করলেন। কালীর গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছেন

না তিনি। কিছুদূর যেতে চোখে পড়ল একটা পুরনো ধরনের দোতলা বাড়ি তার সামনে অনেক লোকের জটলা, বেশিরভাগই ইউনিফর্ম পরা পুলিশ। রাস্তার আলোর দেখা গেল ইন্সপেক্টর প্রধানকেও। বাড়িটার সামনের খোলা দরজার সামনে তিনি হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ... সঙ্গে আরও অনেকে। তাঁরা যখন পঞ্চাশ গজ দূরে তখন ইন্সপেক্টর প্রধান খোলা দরজার ভিতরের অন্ধকার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। ভিতর থেকে যে আওয়াজটা শোনা গেল সেরকম কিছু কখনও শোনেননি বিনয়বাবু। কোন বিষধর সাপ ফণা তুলে যেরকম আওয়াজ করে, অনেকটা সেইরকম, কিন্তু অনেক গুণ বেশি জোরালো। বিনয়বাবু একটু থমকে গেলেও কালী একই গতিতে দৌড়ে বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল অন্যরা তাকে সাবধান করার আগেই, সে পাশ কাটিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। তখন প্রচন্ড গর্জনে ঘরের ছাদ পর্যন্ত ফণা তুলল সেই মহাসর্প ... বাইরে থেকে অনেকগুলো টর্চের আলোতে তার বিশাল আকার এখন দেখা যাচ্ছে। বিনয়বাবু প্রাণপণে চিৎকার করলেন "কালী, ভিতরে ঢুকিস না ...।"



ওদিশের শাণিত খঞ্জর যখন তার হৃৎপিন্ডে বিদ্ধ হচ্ছে, এক পলকের জন্য হতভাগ্য ভৃত্যটির চোখে চোখ পড়ল তার। সেই দৃষ্টির সুগভীর ঘৃণা, নৃশংস স্বার্থসর্বস্ব ওদিশের মস্তিষ্কের কোণ এক কোণে, মুহূর্তের জন্য হলেও, আঘাত করল। তবে সে মাত্র এক মুহূর্তের জন্যই। অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করার লালসা, দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শুধু ভয় দেখিয়ে পদানত করে রাখার সুখ স্বপ্ন ওদিশের সমস্ত শুভ বুদ্ধি ধীরে ধীরে কণ্ঠরোধ করে এনেছিল। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, আজকের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর সেটুকুও মুছে গেল চিরতরে। গিয়ালপো ও তাঁর অন্য শিষ্যরা সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। এই ভাষায় আজ ওদিশ স্বচ্ছন্দ, সেও অন্যদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছিল। তার দুই হাত তখন এক বিভৎস কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত ... মৃত দাসটির বুক চিরে বার করে আনা হয়েছে তার হৃৎপিন্ড ... তখনও সেটি উষ্ণ। অন্যদিকে অগ্নিকুণ্ডে নানা রকম জিনিস আহুতি দেওয়া হচ্ছে। ধোঁয়া এবং কটু গন্ধে ঘর ভরে গেছে। মন্ত্রোচ্চারণের আওয়াজ ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছে ... ওদিশ ধীরে

ধীরে এগিয়ে আসছে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ... রক্তমাখা দু-হাতে অপদেবতাদের পরম কাম্য আহুতি, সদ্য বলি দেওয়া মানুষের হৃদয়। ওদিশ জানে না এর সঙ্গে আহুতি হবে আরও অনেক কিছুর ... তার শুভ বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব ... ন্যায় অন্যায় বোধ। ক্ষমতা অর্জনের এমনই লোভ যে এসবের মূল্য তার কাছে এখন তুচ্ছ।

ওদিশ এসে অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়ানো মাত্রই এক গভীর গর্জন শোনা গেল, যেন পাতালের গভীর থেকে উঠে আসছে। অগ্নিকুণ্ড থেকে কালো ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী পাক খেতে খেতে ওপর দিকে উঠতে থাকে। ওদিশ আর দেরি না করে হৃৎপিন্ডটা আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়। একটা তীক্ষ্ণ অমানুষিক অট্টহাস্য ওদের সবার কানে তালা ধরিয়ে দেয় ... ধোঁয়ার কুন্ডলীটা একটা আকার নিতে থাকে। সবাই একটু পিছিয়ে যায় ... মন্ত্র পাঠ চলতে থাকে অবিরাম। এখন ধোঁয়ায় কুন্ডলীটা বিশাল অবয়ব ধারণ করছে ... ভয়ঙ্কর এক দানবীয় রূপ ... তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। এর আগে কয়েকবার অপশক্তির আবাহনে যোগ দিয়েছে ওদিশ ... কিন্তু আজ যে এসেছে তার ভয়াবহ রূপ তার কল্পনাতীত ছিল। গিয়ালপো বার বার করে বলেছিলেন যেন আবাহনের সময় ভয় না পায়। যত বিভৎসই হোক, অপদেবতার চোখে চোখ রাখতে হবে। না হলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এরা নিম্ন বুদ্ধির প্রেত ... নিজে শক্ত থাকলে তবেই এরা বশে থাকবে। জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো দুটো চোখ এখন ওদিশের দিকেই তাকিয়ে আছে। ওদিশ ভীরু নয়, কিন্তু তার বুকের ভিতর কেঁপে উঠল যেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার এক অট্টহাসি ঘর কাঁপিয়ে দিল। বহু চেষ্টা করেও ওদিশ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারল না। গিয়ালপো ওদিশকে লক্ষ্য করছিলেন, তিনি প্রমাদ গুনলেন। এই ক্রুর প্রেতেরা আহ্বায়কের দুর্বলতা সহজেই বুঝতে পেরে যায়, আর তাহলেই মহা বিপদ। ততক্ষণে সেই প্রেত এক বিশাল আকার ধারণ করেছে। অগ্নিকুণ্ড থেকে সে সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম করছে। এখন ওদিশের উচিত অন্য মন্ত্র পড়ে তাকে তুষ্ট করে ফেরত পাঠানো। কিন্তু দেখা গেল, ওদিশ সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত ... ভুল মন্ত্র পড়ছে। অন্য শিষ্যরাও কী করবে ঠিক করতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। গিয়ালপো শেষরক্ষা করার জন্য সঠিক মন্ত্র বলতে শুরু করলেন। কিন্তু আজ তো

আহ্বায়ক ওদিশ, গিয়ালপো নন। হঠাৎ এক বিকট গর্জন করে সেই দানব অগ্নিকুণ্ডের বাইরে এসে ওদিশের সামনে দাঁড়াল। ওদিশ পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করেও তার আর সময় পেল না ... দুই রোমশ হাত দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করল সে। তার পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল ... দানবের শরীর আবার ধোঁয়ার রূপ নিয়ে ওদিশের শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে থাকল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, অপদেবতা অদৃশ্য হল ... অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে রইল ওদিশ। কিন্তু এ কি ওদিশ? তার চেহারায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সুদর্শন সেই যুবকের জায়গায় যে দাঁড়িয়ে আছে তার সঙ্গে মিল থাকলেও অমিলই বেশি। তার শরীর যেন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বেড়ে গেছে, সারা শরীরে পশুর মতো লোম, মুখের ভিতর থেকে শ্বাপদের মতো দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে, হাতে দীর্ঘ নখ ... আর সবচেয়ে ভয়ানক তার চোখ দুটো। কোন মানুষের চোখ এরকম হতে পারে না।

গিয়ালপো বুঝলেন কি সর্বনাশ হয়ে গেছে। তীব্র কণ্ঠে শিষ্যদের তখনই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বললেন। পর মুহূর্তেই ওদিশরূপী শয়তান তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গিয়ালপো একজন দীর্ঘদেহী বলশালী পুরুষ। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না তিনি। ওদিশ তাঁর কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলে, ক্ষতের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আকণ্ঠ রক্ত পান করতে লাগল।

মৃত্যুর আগের মুহূর্তে গিয়ালপো বুঝতে পারলেন কেন তিনি ভবিষ্যত গণনা করতে পারছিলেন না। তাঁর দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই ভবিষ্যতের ঘটনাক্রম তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়নি।

প্রচণ্ড কোলাহল শুনে মিত্তার ঘুম ভেঙে গেল। একজন এসে তাঁকে পালিয়ে যেতে বলল। বাইরে এসে দেখেন গিয়ালপোর সব শিষ্যরা এবং মঠের অন্য বাসিন্দারা সবাই পালাচ্ছে। কিছু বোধগম্য হল না তাঁর কীসের ভয়ে সবাই এত ভীত সন্ত্রস্ত। বয়স তাঁর গতি স্তিমিত করে দিয়েছে। অন্যদের মতো তাড়াতাড়ি বার হতে পারলেন না তিনি। তাঁর শয়নকক্ষের বাইরে একটি মাত্র মশাল জ্বলছিল। তার আলোতে দেখলেন মঠের ভিতর দিক থেকে শ্বাপদসুলভ ক্ষিপ্রতার বেরিয়ে এল একটি মূর্তি। একি ওদিশ? না না এ ওদিশ হতে পারে না। এ তো মানুষই নয়। দ্বিপদ কোন অজানা হিংস্র প্রাণী। তার সমস্ত মুখ রক্তে লাল, দু-হাতের দীর্ঘ নখেও লেগে আছে তাজা রক্ত ...

আর বন্যজন্তুর চোখের মতো তার ঈষৎ সবুজাভ চোখ মশালের আলো পড়ে ভয়ানক দেখাচ্ছে।

প্রাণীটা একটু কুঁজো হয়ে বাইরের দরজার দিকে এগোচ্ছিল। মিত্তার দিকে চোখ পড়তে সে থমকে যায়। মিত্তা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মাতা কুবেলির নাম জপ করছিলেন। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল প্রাণীটির চোখ মানুষের মতো হয়ে গেল ... এই চোখ তাঁর বড় পরিচিত ... এ তো তাঁর বড় স্নেহের ওদিশ। কিন্তু ওই এক মুহূর্ত মাত্র ... তারপরই তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘ কয়েক লাফে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। বাকি রাত অর্ধচেতন অবস্থায় দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ওখানেই বসে থাকলেন মিত্তা। দিনের আলো ফোটার পর মঠবাসীরা ফিরে এল একে একে। তাদের মুখেই পূর্বাপর ঘটনা শুনলেন তিনি। ওদিশের কাল রাত্রে ভৃত্যটিকে বলি দেবার কথা শুনে বেদনায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর। পুত্রসম ওদিশের এরকম আত্মিক অবনতি তাঁর কাছে অকল্পনীয়। তার পরের ঘটনা শুনে তিনি মানসিকভাবে একেবারেই ভেঙে পড়লেন।

গিয়ালপোর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেলে মিত্তা আর এই অশুভ জায়গায় এক দিনও থাকতে চাইলেন না। দেহরক্ষী সৈনিকদের নিয়ে তিনি ফিরে যাবার পথ ধরলেন। গিয়ালপোর প্রধান শিষ্য এখন কার্যনির্বাহক মঠাধ্যক্ষ। তিনি সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক দিলেন। যাবার সময় মিত্তা পুঁথি দুটি তাঁর হাতেই সমর্পণ করলেন।

এই কদিনে আশেপাশের জনবসতির লোকেদের মুখে এক ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা শোনা গেল। পাহাড়ে জঙ্গলে সে ঘুরে বেড়ায়। হিংস্র তুষারচিতাও তার সামনে পড়লে ভয়ে পালিয়ে যায়। এর হাতে দুজন মানুষ মারা যাবার পর সন্ধ্যার পর কেউ সশস্ত্র না হয়ে বাড়ির বাইরে বার হয় না। এই প্রাণী যে ওদিশ ছাড়া আর কেউ নয় তা মিত্তা ও মঠবাসীরা সবাই বুঝলেন।

ভগ্ন হৃদয় নিয়ে কোনক্রমে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মিত্তা ও তাঁর সঙ্গীরা এসে পৌঁছলেন সেই গ্রামে যেখানে বাকি দেহরক্ষী ও ভৃত্যদের অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। এখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল এক বিস্ময়। দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেছে এর মধ্যে। অপেক্ষারত দেহরক্ষীরা ওঁদের কোন সংবাদ না পেয়ে ধরে নিয়েছিল ওঁরা আর বেঁচে নেই। কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলে দেশে

ফিরে যাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। তাছাড়া ঐ গ্রামে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা তাতে খুশিই হয়েছিল, কারণ এই দক্ষ সৈনিকরা থাকার জন্য গ্রামে কোন দস্যুর আক্রমণ হয় না, শিকার পেতেও অসুবিধা নেই। সব ব্রিগোবাসী সৈনিক ও দাস, স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করে সংসার পেতে বসেছে। সন্তান সন্ততিও হয়েছে অনেকের। তারা দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য খুব একটা উৎসুক নয়। মিত্তাকে দেখে তারা সবাই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাদের আন্তরিক সেবা যত্নে মিত্তা মাস খানেকের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। একদিন তারা সবাই মিত্তার কাছে এক অনুরোধ নিয়ে এল। মিত্তাও যেন এই গ্রামে তাদের সঙ্গে থেকে যান। তারা গ্রামে মাতা কুবেলির মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে। ভৃত্যদের মধ্যে একজন দক্ষ ভাস্কর আছে, সে ইতিমধ্যেই মূর্তি গড়ার কাজ শুরু করেছে। মিত্তা যদি পূজারী হিসেবে এখানে থেকে যান তাহলে তারা কৃতার্থ বোধ করবে। তাছাড়া ওরা একদল বণিকের মুখে শুনেছে দেশের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। ওদিশের পিতা সম্ভবত বেঁচে নেই। গ্রিকদের আধিপত্য তো আছেই, দিন দিন পার্থিয়ান দের দৌরাত্ম্যও বেড়ে যাচ্ছে। ব্রিগোরা এখন সম্পূর্ণভাবে পরাধীন।

মিত্তা রাজি হয়ে গেলেন। তিনি যেখানেই থাকুন, মাতা কুবেলির আরাধনায় শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চান। ওদিশের পরিণতির জন্যও তিনি নিজেকে দোষারোপ করেন। দেশে ফিরে আর কি করবেন তিনি?

এর তিন বছর পর মিত্তা ইহলোক ত্যাগ করেন তাঁর আরাধ্যা দেবীর ধ্যান করতে করতে। আশপাশের আরও পাঁচটা গ্রামের লোক একত্র হয় তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এক বছর পর তাঁরও একটি মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেবীর সঙ্গে তিনিও পুজো পেতে থাকেন।

কেটে যায় দুই সহস্রাব্দেরও বেশি সময়।

আধুনিক যুগের মানুষের কাছে হিমালয়ের ঐ প্রত্যন্ত গ্রামটি একটি রহস্য। আশপাশের এলাকায় সব মানুষের মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রামের মানুষদের মুখ ও শারীরিক গড়ন ককেশীয় ধাঁচের। তাদের ভাষার সঙ্গেও কোন পরিচিত ভাষার মিল নেই। তারা কঠোরভাবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য

রক্ষা করে। তাদের মন্দিরে উপাস্য দেবতা বাইরের জগতের অজানা, কোন এক মিত্তা ঋষি। পরম ভক্তিভরে গ্রামবাসীরা তাঁর পূজো করে।



কেউ বাধা দেওয়ার আগেই কালী সবাইকে পাশ কাটিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল সর্পদানবের সামনে। রাস্তা জুড়ে কুন্ডলী পাকানো বিশাল সাপ, তার ঘরের ছাত অবধি উঁচু ফণা, তাকে বিচলিত করেছে বলে মনে হল না। আতঙ্কে বিনয়বাবুর চোখ বন্ধ করে ফেললেন। ঘরে ঢুকে কালী এক হুঙ্কার দিল "জয় মা রুদ্রচন্ডী, পাপীদের বিনাশ করো মা ... তোমার সন্তানদের রক্ষা কর"। তারপর সোজা দৌড়ে গেল উপরে যাবার দরজা আটকে থাকা সাপটার দিকে। তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল ... সাপটা আস্তে আস্তে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকল। কালী স্বচ্ছন্দে তার দেহ ভেদ করে পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ বাহিনী, ইন্সপেক্টর প্রধান, বিনয়বাবুর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ঐ ভয়াবহ সাপ অদৃশ্য হয়ে গেল। ইন্সপেক্টরের কানে কানে সেই ছোকরা কনস্টেবলকে বলল "স্যার আমি বলেছিলাম, না, মাস হিপনোটিজম এর ব্যাপার"। কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রথমে ইন্সপেক্টর প্রধান এবং তাঁর পিছনে জনা দশেক সশস্ত্র পুলিশ হুড়মুড় করে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। প্রথম ঘরটার পরের ঘরে উপরে ওঠার সিঁড়ি। ঘরের মধ্যে ও সিঁড়ির ওপর দোরজের দলবলের লোকেরা রাস্তা আটকে বসে ছিল। সংখ্যায় অনেক হওয়া সত্ত্বেও কালিকিঙ্করকে আটকাতে পারল না তারা। কী যেন ভর করেছে তার উপর, শরীরে মত্ত হস্তীর বল ... তার হাতের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল লোকগুলো। প্রথমে তাকে আটকানোর চেষ্টা করলেও ওর পিছনে বন্দুকধারী পুলিশদের দেখে তারা রণে ভঙ্গ দেয়। ঝড়ের গতিতে কালী সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। ইন্সপেক্টর প্রধান আরও দুজন কনস্টেলবে নিয়ে ওকে অনুসরণ করেন। বাকিদের বলেন নিচের লোকগুলোকে আটকে রাখতে। উপরেও দুটো ঘর। প্রথম ঘরে কুকরি হাতে তিনজন লোক পাহারা দিচ্ছিল। তারা কালীকে আক্রমণ করার উপক্রম করতেই প্রধান একজনের পায়ে গুলি করেন। সে পড়ে যেতে বাকি দুজন চুপচাপ আত্মসমর্পণ করে কুকরি মাটিতে

ফেলে দিয়ে। পিছনের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কালীর সজোরে পদাঘাতে ছিটকিনি ভেঙে দরজা খুলে যায়। ভিতরে দেখা যায় এক অগ্নিকুণ্ড, ঘরের ঠিক মাঝখানে। তার সামনে সর্বশরীর কালো আলখাল্লায় ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে দোরজে ... অগ্নিকুণ্ডে কিছু কিছু আহুতি দিচ্ছে আর অজানা ভাষায় এক বিচিত্র সুরে মন্ত্র পাঠ করে যাচ্ছে। বাইরে এত কোলাহল, গুলির আওয়াজ তার যেন কানেই যায় নি। ঘরের একটা মাত্র জানালা খোলা। তাতেও ভিতরে ধোঁয়া আর দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার মতো অবস্থা। কালী ঘরে ঢুকতেই, সামনে আবির্ভূত হল দুই শরীরি প্রেত যাদের ইন্সপেক্টর প্রধান একটু আগেই রাস্তায় দেখেছেন। প্রধান একটু থমকে গেলেন ... কারণ বন্দুকের গুলিতে যে এদের কিছু হয় না তা আগেই দেখেছেন। ঘরের আবছা আলো আঁধারিতে তাদের বিভৎস মুখ দেখে পিছনের কনস্টেবলরা ভীষণ রকম চমকে গেল। শুধু সেই ছোকরা "আবার মাস হিপনোটিজম" বলে তার বন্দুক তুলেছিল। প্রধান তাকে নিরস্ত করলেন। কালীর আজ কোন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই ... সে অকুতোভয়ে দুই বিকট দর্শন মূর্তির দিকে এগিয়ে গেল ... মুখে সেই একই রণহুঙ্কার "জয় মা রুদ্রচণ্ডী"। আশ্চর্য ব্যাপার ... প্রেত দুটো পিছিয়ে যেতে থাকল। ঠিক সেই সময় চোখে পড়ল ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটি ছেলে শুয়ে আছে। নড়াচড়া করছে না ... জ্ঞান নেই বলে মনে হয়। তার মাথার কাছে দোরজেরই মতো কালো আলখাল্লা পরা একজন কুকরি হাতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। সে দোরজের মানুষ অনুচর।

দোরজের মন্ত্র পাঠ এইবার থেমে গেছে। তার প্রেত ভৃত্য দুজন কালীকে আটকাতে পারল না দেখে সে একটু হতচকিত। কালী কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এক লাফে বাচ্চা ছেলেটির কাছে পৌঁছে তাকে দু-হাতে তুলে নিল। সবই এত দ্রুতগতিতে ঘটেছে যে দোরজে ও তার অনুচর কালীকে বাধা দিতে পারেনি। শেষ মুহূর্তে অনুচরটি কুকরি তুলে কালীকে আঘাত করার চেষ্টা করতেই ইন্সপেক্টর আবার গুলি চালালেন। আর্তনাদ করে কুকরি ফেলে হাত চেপে ধরে বসে পড়ল সে ... তার কব্জিতে গুলি লেগেছে ... সম্ভবত কব্জির হাড় ভেঙে গেছে তার। কালীর একটাই উদ্দেশ্য ছিল ... ছেলেটিকে বলি হওয়া থেকে বাঁচানো। ছেলেটিকে কোলে তুলে সে তীরবেগে দৌড় দিল বাইরের দিকে। একটা ক্রুদ্ধ গর্জন বেরিয়ে এল দোরজের গলার ভিতর থেকে

তারপর সবার চোখের সামনে তার শারীরিক পরিবর্তন হতে থাকল। দু হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলল তার আলখাল্লা ... ইন্সপেক্টর ও পুলিশ বাহিনীর সবার বিস্ময় বিস্ফারিত চোখের সামনে তার শরীর দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দেড়গুণ বেড়ে গেল ... দেখা গেল সারা শরীরে ঘন লোম ... হাতের নখ দীর্ঘ ... মুখগহ্বরের মধ্যে শ্বাপদের মত ছুঁচলো দাঁত দেখা যাচ্ছে ... সবুজ চোখ বন্যপশুদের মতো আধা অন্ধকারে ঝলসে উঠছে ... এ এক ভয়াল ভয়ঙ্কর অজানা প্রাণী। এবার আর ইন্সপেক্টরের অনুমতি নেবার অপেক্ষা করল না কেউ। দুজন কনস্টেবল উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ করল প্রাণীটির শরীরে। শরীরে গুলি আঘাত করলেও তাতে সে বিন্দুমাত্র কাতর হয়েছে মনে হল না। এক দীর্ঘ লম্ফে খোলা জানালার কাছে পৌঁছে গেল সে, দু-হাতে জানালার গ্রিলে টান দিয়ে অবলীলায় খুলে খেলল ... তারপর জানলা দিয়ে আর এক লাফ দিয়ে বাইরের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। তার দুই শরীরি প্রেত ভৃত্যও আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় তার পিছু নিল। তবে তার মানুষ অনুচরের তাকে অনুসরণ করার ক্ষমতা ছিল না। এই পুঁথির কেসে পর পর এত অনৈসর্গিক ঘটনা দেখছেন ইন্সপেক্টর প্রধান কিছুদিন যাবত, সবার আগে তাঁরই সম্বিত ফিরল ... সবাইকে হুকুম দিলেন "এখনই বাইরে বেরোও। ও ছেলেটিকে নিয়ে আসার জন্য বাঙালিবাবুর পিছনে গেছে। ওদের বাঁচাতে হবে।"

কালী বাচ্ছাটাকে কাঁধের ওপর ফেলে ঝড়ের গতিতে ছুটছিল মনাস্টারির দিকে। পিছনে বিনয়বাবু, ইন্সপেক্টর ও ছ-সাত জন কনস্টেবল। বাকিদের রেখে আসা হয়েছে দোরজের দলবলের ওপর চোখ রাখার জন্য। কালী প্রায় মনাস্টারির কাছে পৌঁছে গেছে, তখন সামনে থেকে একটা চাপা গর্জন শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মনাস্টারির সামনে দাঁড়িয়ে পরিবর্তিত চেহারার দোরজে, সামনে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে যেন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতীক্ষায়। তার দু-পাশে দুই শরীরি প্রেত রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে। দোরজের কোন কিছুই আর মানুষের মতো নয়। মুখের দু-পাশ দিয়ে দুটো ছুঁচলো শ্বদন্ত অনেকটা বেরিয়ে এসেছে। আলো আঁধারিতে সবুজাভ চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

বাইরে গোলমাল শুনে প্রফেসর দাশগুপ্ত ও মনীশ মনাস্টারির দরজায় এসে বাইরে কী হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছেন। ভিতরে লামা ও হরেন্দ্রনাথের

পুজো চলছে। দুজনেই ধ্যানমগ্ন, বাইরে আসার কোন প্রশ্নই নেই। বিনয়বাবু প্রমাদ গুনলেন ... এবার কি কালী রক্ষা পাবে? ঠিক সেই সময় মনাস্টারির পাশের অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এলেন এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, হাতে একটা কমণ্ডলু ... এসে দাঁড়ালেন কালিকিঙ্কর আর দোরজের মাঝখানে। রাস্তার আলোয় তাঁর মুখ দেখা যেতে বিনয়বাবু চিনতে পারলেন, এঁর সঙ্গেই তো দক্ষিণাকালি মন্দিরে তাঁর দেখা হয়েছিল। চিনতে পারল কালীও ... এই তো সেই গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের সাধুবাবা।

দেখা গেল আক্রমনোদ্যত দোরজে আর এগোতে পারছে না। পিছনেও মনাস্টারির মধ্যে দেবী একজটা ও রুদ্রচন্ডীর পুজো চলছে ... এক শক্তিবলয় ঘিরে রেখেছে পুরো মনাস্টারিকে ... তা ভেদ করে ভিতরে ঢোকা তার জন্য অসম্ভব। ক্রুদ্ধ হয়ে শ্বাপদরূপী দোরজে আকাশের দিকে মুখ তুলে এক তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়ল ... পর পর কয়েকবার। তৃতীয়বারের পর প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল ... এক গভীর গর্জন শোনা গেল।

হঠাৎ দেখা গেল দোরজের পাশে আবির্ভাব হয়েছে এক বিশাল ছায়ামূর্তি, যেন অন্ধকার দিয়ে তৈরি তার অবয়ব। শুধু জ্বলন্ত কয়লার মতো লাল চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। দোরজে আবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করল তিনবার। এবার উপস্থিত হল আর এক ভয়ালদর্শন মূর্তি, দু-হাতের তিনটি করে আঙুলে ধারালো ছোরার মতো নখ। পুলিশ বাহিনীর লোকেরা সবাই ভগবানের নাম জপছে। এই প্রেতলোকের বাসিন্দাদের যে বন্দুক পিস্তলের গুলিতে কিছু হবে না তারা বুঝেছে। শুধুমাত্র সন্ন্যাসী অবিচলিত ভাবে তাদের দিকে এগিয়ে চলেছেন তিন ভয়ঙ্করের সমবেত গর্জন আস্ফালন উপেক্ষা করে। একটা জিনিস ইন্সপেক্টর লক্ষ্য করলেন ... এই তিনজন কিন্তু এগিয়ে আসতে পারছে না সন্ন্যাসীর দিকে। একজন একটা বিরাট পাথর তুলে ছুঁড়ে দিল সন্ন্যাসীর দিকে। পাথরটা মধ্যপথেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল। সন্ন্যাসী এদের খুব কাছে চলে এসেছেন, ওদের সমবেত ক্রুদ্ধ গর্জনে আশপাশের কিছু বাড়ির জানলা খুলে গেছে, কৌতূহলী কিছু লোক উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। এরা গুলির আওয়াজ শুনে কিন্তু জানলা খোলেনি। অন্ধকারে দূরের বাড়িগুলো থেকে কিছু দেখা না গেলেও, কাছের বাড়ির বাসিন্দারা জানলা

খুলেই সভয়ে আবার বন্ধ করে দিচ্ছে।

এই সময়ে দোরজে আর তার আবাহন করা দুই অপদেবতাকে ঘিরে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল চক্রাকারে। মনে হল যেন অপদেবতাদের আস্ফালন, তর্জন গর্জন একটু থমকে গেছে। আগুনের শিখা ক্রমশই বেড়ে উঠতে লাগল। সন্ন্যাসী সেই অগ্নিবলয়ের সামনে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু মন্ত্রোচারণ করে কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন ওদের দিকে। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে দুই অপদেবতা হাওয়ায় মিলিয়েই গেল। এবার সন্ন্যাসী আবার জল ছিটিয়ে দিলেন দোরজের অনুচর দুই শরীরি প্রেতের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই মাটিতে পড়ে গেল এবং তাদের শরীরে আগুন ধরে গেল।

অল্প সময়ের মধ্যেই দু-মুঠো ছাই ছাড়া তাদের আর কিছু অবশিষ্ট থাকল না। এই ঘটনাগুলো যখন ঘটে চলেছে তখন দোরজে প্রাণপণ চেষ্টা করছে আগুনের গন্ডির বাইরে আসার। কিন্তু কী যেন তাকে বেঁধে রেখেছে। তার ক্রুদ্ধ গর্জনও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে।

এবার সন্ন্যাসী তার দিকে ফিরলেন ... দীর্ঘ এক মন্ত্র পড়ে কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন তার পশু শরীরে। তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সমবেত প্রত্যক্ষদর্শীর বিস্ময় বিস্ফারিত চোখের সামনে দোরজের পশু শরীরে আবার পরিবর্তন দেখা দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেল প্রায় নগ্ন গৌরবর্ণ এক সুদর্শন যুবক, নতজানু হয়ে হাতজোড় করে সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে কিছু বলছে ... তার গলার স্বর করুণ ... এবং তার চোখে জল। এ তো দোরজে নয়। সন্ন্যাসীও তাকে সেই অজানা ভাষায় কোমল স্বরে কিছু বললেন। তারপর কমণ্ডলু থেকে জল ঢেলে দিলেন যুবকের মাথায়, শরীরে। তখন সেই আগুনের চক্রাকার গন্ডি ছোট হতে থাকল। আস্তে আস্তে আগুন শুধু সেই যুবককেই বেষ্টিত করে ফেলল ... সে তখনও করজোড়ে নতজানু হয়ে বসে আছে ... দুচোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ সন্ন্যাসীর দিকে ... সে চোখে কৃতজ্ঞতা। লেলিহান হয়ে উঠল অগ্নিশিখা ... আশ্চর্য দ্রুতগতিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল যুবকের শরীর।

ততক্ষণে বিনয়বাবু, কালী, ইন্সপেক্টর সবাই সন্ন্যাসীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। সন্ন্যাসী যেন স্বগতোক্তি করলেন ... নিজের মনেই হিন্দিতে

বললেন "দু-হাজার বছর পরে ওর আত্মা মুক্তি পেল। এবার আমারও মুক্তি"। আকাশের দিকে দু-হাত তুললেন সন্ন্যাসী। তারপর এত মানুষের বিস্মিত চোখের সামনে বাতাসে মিলিয়ে গেল তাঁর শরীর।" পূর্ব আকাশে তখন একটু একটু আলোর আভা দেখা যাচ্ছে।

ঘন্টাখানেক পর সবাই মনাস্টারির প্রধান প্রার্থনা কক্ষে বসে চা পান করছেন। হরেন্দ্রনাথ ও লামাও উপস্থিত সেখানে। সবাই কালীকে জিজ্ঞাসা করল সে এরকম মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে ছেলেটিকে উদ্ধার করতে দৌড়ল কেন। কালী বলল "হরেন স্যার পুজো করছিলেন, তখন আমি একমনে মায়ের ধ্যান করছিলাম। হঠাৎ মাথার মধ্যে কে যেন বলল 'ছেলেটিকে বাঁচা, দেরি করিস না' ... তখনই আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেরিয়েছি। কোনদিকে যাচ্ছি, কোথায় গেলে ছেলেটাকে পাব কিছুই জানি না ... কে যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর কী হয়েছে সব আমার আবছা আবছা মনে আছে, আপনারাও দেখেছেন।"

হরেন্দ্রনাথ বললেন "মা তোমাকে দিয়ে যা করাবার করিয়ে নিয়েছেন।" লামাও তাই বললেন।

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন "যা দেখলাম তা অলৌকিক বললে কম বলা হবে। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, ওই পিশাচ সিদ্ধ শয়তান দোরজের জায়গায় ঐ যুবক কী করে এল। সে হাতজোড় করে সন্ন্যাসীর কাছে ক্ষমা চাইছিল মনে হল। ঐ সন্ন্যাসীই বা কে?" প্রফেসর দাশগুপ্ত বললেন "ওদের দুজনের মধ্যে সম্ভবত ফ্রিজিয়ান ভাষায় কথা হচ্ছিল। প্রাচীন গ্রিক আমার জানা, আর ফ্রিজিয়ান ভাষার সঙ্গে মিল আছে বলে একটু একটু বুঝতে পেরেছি।"

সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল কী বুঝতে পেরেছেন প্রফেসর।

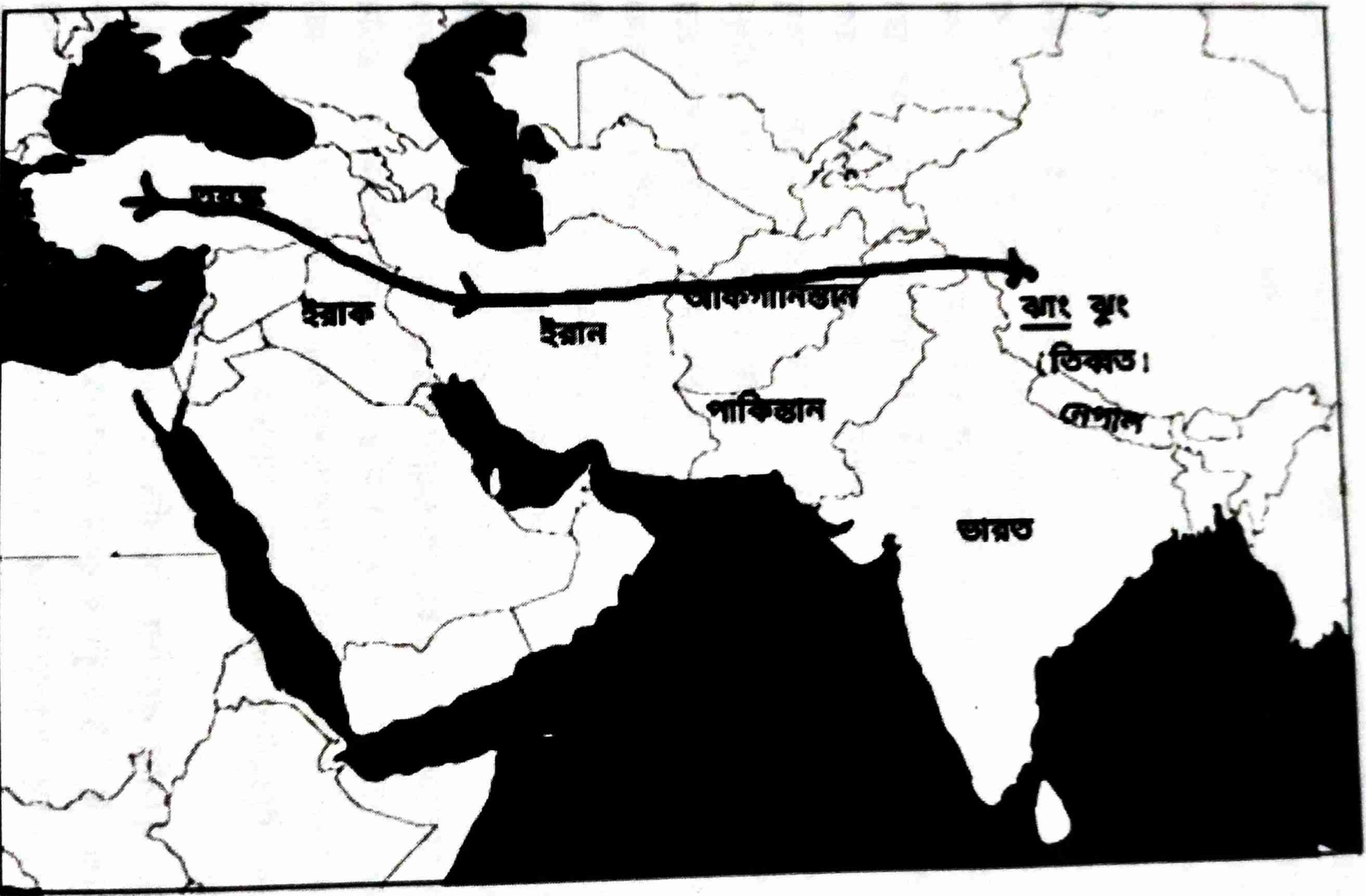
—"এটুকু বুঝলাম যুবকটি অত্যন্ত অনুতপ্ত, দু-হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এক অভিশাপ বয়ে চলেছে জন্ম জন্মান্তর ধরে। সে মুক্তি চাইছিল। সন্ন্যাসীকে সে 'মিত্তা বলে সম্বোধন করছিল। সন্ন্যাসী বললেন যুবকের মুক্তি না হলে তাঁরও মুক্তি হবে না। তিনিও বহু জন্ম ধরে সাধনা করে চলেছেন এই মুহূর্তের জন্য।"

বিনয়বাবু বললেন "এর থেকে শুধু এইটুকুই বোঝা গেল মিত্তা, মানে পুঁথিতে যিনি ফ্রিজিয়ান ভাষায় মাতা কুবেলির প্রার্থনা মন্ত্র লিখেছিলেন। আর তো কিছুই বোঝা গেল না।" লামা ধীর স্বরে বললেন "এ বিশ্ব জগতের অপার রহস্যের কতটুকুই বা আমরা বুঝি?"

বিনয়বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন "কিন্তু পুঁথিটা কোথায়?" লামা উঠে গিয়ে তথাগতর মূর্তির পিছনে একটা গুপ্ত জায়গা থেকে পুঁথিটা বার করে এনে বিনয়বাবুকে দিলেন। বললেন "আশা করি এ পুঁথি আর অমঙ্গল ডেকে আনবে না" হরেন্দ্রনাথ বললেন 'তবুও সাবধানের মার নেই। যেখানে আমি মা রুদ্রচন্ডীর পূজো করেছি সেখানে নিয়ে রাখুন ওটা। আমি শুদ্ধ করে দিই।"

বিনয়বাবু হাতে করে পুঁথিটা নিয়ে পূজাবেদির সামনে রাখলেন। হরেন্দ্রনাথ মন্ত্র পড়া শুরু করেছেন ... তাঁদের সবার চোখের সামনে শেষ অলৌকিক ঘটনাটা ঘটল ... পুঁথিটা আটজোড়া বিস্ফারিত চোখের সামনে গুঁড়ো হয়ে ঝরে যেতে থাকল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পড়ে থাকল হলদেটে বাদামি রঙের গুঁড়োর একটা ছোট স্তূপ। কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া ঢুকল ঘরের মধ্যে ... গুঁড়োগুলোও তার সঙ্গে উড়ে গেল।





ওদিশ ও মিত্তার যাত্রাপথ

টীকা

মিলিন্দপঙ্হ : বিখ্যাত একটি বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক মিলিন্দপঙ্হ, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ব্যাক্ট্রিয় গ্রিক সম্রাট মিনান্ডার ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনার কথোপকথনের সংকলন। মিনান্ডারকে বৌদ্ধ লেখকরা মিলিন্দ নামে লিখতেন। মিলিন্দর প্রশ্ন ... পালি ভাষায় মিলিন্দপঙ্হ নামে বিখ্যাত।

ফ্রিজিয়া/ফ্রিগো/ব্রিগো : খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক পর্যন্ত ফ্রিজিয়া উত্তর পশ্চিম আনাতোলিয়ায় (তুরস্ক) অবস্থিত একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল। ফ্রিজিয়ার রাজধানীর নাম ছিল 'গর্দিয়ন' বা 'গর্দিয়াম'। ফ্রিজিয়রা সম্ভবত গ্রিস থেকে এসে ওখানে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেছিল। ট্রয়ের যুদ্ধে ফ্রিজিয়রা ট্রয়বাসীদের পক্ষ নিয়েছিল মনে করা হয়। ইতিহাস ছাড়া ফ্রিজিয়দের উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রিক পুরাণে, মহাকাব্যে এবং কিংবদন্তিতে। রাজা গর্দিয়াস (গর্ডিয়ান নট খ্যাত) ও রাজা মিডাস (যা কিছু স্পর্শ করত তাই সোনা হয়ে যেত) সম্বন্ধে গল্প সারা বিশ্বে প্রচলিত। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে যাযাবর কিমেরিয় জাতির আক্রমণের পর ফ্রিজিয়রা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং প্রথমে লিডিয় এবং পরে পারস্য দেশের অধীন হয়ে যায়। আলেকজান্ডারের বিজয় অভিযানের পথে থাকার জন্য ফ্রিজিয়রাও শক্তিশালী গ্রিক বাহিনীর পদানত হয়। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর ফ্রিজিয়া, সেলুসিড গ্রিক সাম্রাজ্যের একটি করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ১১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ফ্রিজিয়া রোম সাম্রাজ্যের পদানত হয়। বহু শতাব্দী ধরে ফ্রিজিয়া পরাধীন থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর ফ্রিজিয়রা আশেপাশের অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন আধুনিক আর্মেনিয় জাতি ফ্রিজিয়দের বংশধর।

মাটার কুবেলি/কুবেলিয়া/সিবেলি : ফ্রিজিয়দের আরাধ্য মাতৃদেবীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ও দুদিকে দুই সিংহ সমেত মূর্তি পাওয়া গেছে। কুবেলিকে মনে করা হত দেবতাদের মাতা। মাতৃত্ব, উর্বরতা ও পার্বত্য অঞ্চলের দেবী রূপে পূজা করা হত কুবেলির। কুবেলির উপাসকরা নিজেদের অন্ডকোষ কেটে ফেলত পূজারি হবার জন্য। রোম এবং গ্রিসে মাতৃদেবীর আরাধনা

সম্ভবত কুবেলির পূজা থেকেই উদ্বুদ্ধ। সিবেলি ও ম্যাগনা মাটার নামে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ফ্রিজিয়দের কুবেলি পূজা থেকেই অনুপ্রাণিত বলে মনে করা হয়।

ননা ঃ রোমান সভ্যতার, নিয়তি ও মাতৃত্বের দেবী। ননা শব্দটি ৯ সংখ্যা থেকে এসেছে। গর্ভাবস্থার ৯ মাস বোঝানোর জন্য এই নাম।

রিয়া ঃ গ্রিক পুরাণের সব দেবদেবীর মা।

উইচ সার্কল/উইক্কান ঃ যদিও উইচ শব্দের বাংলা অর্থ ডাকিনী, আধুনিক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বা ইউরোপে যারা 'উইচক্রাফট' (witchcraft) চর্চা করে তাদের সঙ্গে আমাদের দেশে যাদের 'ডাকিনী' বা 'ডাইনি' বলা হত তাদের পার্থক্য আছে। উনবিংশ শতকের আগে পাশ্চাত্য দেশে এবং এদেশে ধারণাটি মোটামুটি একই ধরনের ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকায় মনে করা হত এরা শয়তানের উপাসক, ঈশ্বরবিরোধী, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতি করাই তাদের ধর্ম। এই কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের জন্য বহু নিরাপরাধ স্ত্রীলোকের প্রাণ গিয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক ইউরোপীয় এশিয়ার ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে এবং এখানকার তন্ত্রমন্ত্রের রহস্যময় ক্ষমতা সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকৃতির শক্তি উপাসনা (shamanism), মাতৃদেবীর আরাধনা, মন্ত্রশক্তি ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়ে নতুন ধর্মমতের প্রচলনের চেষ্টা করে। স্বাভাবিকভাবেই গোঁড়া খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা এবং ধর্মযাজকেরা এসবের ঘোরতর বিরোধী ছিল। সে কারণে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই আধুনিক 'উইচ'রা তাদের কার্যকলাপ যথাসম্ভব গোপনে রাখত। ১৯৭১ সালে ইংল্যান্ডে এক শতাব্দী-প্রাচীন উইচ-বিরোধী আইন তুলে নেওয়ার পর এরা কিছুটা প্রকাশ্যে আসে। মুলতঃ নির্জনে ধ্যান করা, এক মাতৃদেবীর উপাসনা ও নানা ধরনের আচার অনুষ্ঠান এদের ধর্মের অঙ্গ। এরা ছোট ছোট দলে এই সব অনুষ্ঠান করে থাকে, যেগুলিকে 'উইচেস কোভেন' বলা হয়। উইক্কান শব্দটিও ব্যবহার হয় এদের পরিচয় বোঝানোর জন্য। তবে এইসব আচার অনুষ্ঠানের নামে বহু জায়গায় যথেচ্ছ মাদক সেবন ও বিকৃত যৌনাচারের কথাও শোনা গেছে।

চোর্তেন ঃ বৌদ্ধ স্তূপ। নানা আকারের চোর্তেন তিব্বত ছাড়াও লাদাখ,

সিকিম, ভুটান ও নেপালে দেখা যায়। সাধারণত বৌদ্ধ স্তূপে বুদ্ধের দেহাবশেষ বা ব্যবহৃত সামগ্রী থাকে। এছাড়া বিখ্যাত লামাদের অস্থির ওপরেও চোর্তেন তৈরি হয়।

থাঙ্কা ঃ সুতি কাপড় বা সিল্কের ওপর আঁকা বৌদ্ধদেব দেবীর ছবি ও চক্র/মন্ডল ইত্যাদির ছবিকে তিব্বতির থাঙ্কা বলেন। থাঙ্কা সাধারণত ফ্রেমে বাঁধানো হয় না। কাপড়ে মুড়ে গুটিয়ে রাখা থাকে কোন শুষ্ক জায়গায় এবং প্রয়োজনে বাইরে আনা হয়।

তুল্পা ঃ তিব্বতি বৌদ্ধ তন্ত্র অনুযায়ী উচ্চস্তরের সাধকরা মানসিক শক্তির প্রয়োগে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী সৃষ্টি করতে পারেন শূন্য থেকে। এদের স্প্রুলপা বা তুল্পা বলা হয়। মনুষ্য আকৃতির তুল্পা তার স্রষ্টার সঙ্গ দেওয়া ছাড়া তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো কাজ করতে সক্ষম। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সাধক তাকে শূন্যে মিলিয়ে দিতে পারেন।

ওম মনিপদ্মে হুম ঃ 'ওম মনিপদ্মে হুম' এই ষড়াক্ষরি সংস্কৃত মন্ত্র করুনার দেবতা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের হৃদয় থেকে উদ্ভূত।। মনে করা হয় তথাগত বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার সার এই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত।

ওম মাতৃমুয়ে সালে দু ঃ বন ধর্মাবলম্বীদের ব্যবহৃত মন্ত্র। বন ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে এই মন্ত্রের বিষয়ে আছে।

গর্দিয়ন ঃ গর্দিয়ন বা গর্দিয়াম ফ্রিজিয়া রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই শহরের ধ্বংসাবশেষ ১৯৫১ সালে, তুরস্কের আঙ্কারা শহরের আশি কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম ও নবম শতকে এই শহর খ্যাতির শীর্ষে ছিল তার ঐশ্বর্যর জন্য। সপ্তম শতকে সিমেরিয় যাযাবরদের আক্রমণে ধ্বংস হবার পর পারসিকরা আবার গর্দিয়ন শহর নতুন করে তৈরি করে। কিন্তু গর্দিয়ন তার আগের গৌরব আর ফিরে পায়নি।

সুমেরিয়/আসিরিয়/আক্কাদিয় ঃ সুমের কে ঐতিহাসিকরা মনে করেন পৃথিবীর প্রাচীনতম মানব সভ্যতা। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া (অধুনা দক্ষিণ ইরাক) অঞ্চলে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটে খ্রিস্টজন্মের ৪৫০০ বছর আগে। **আসিরিয়** সভ্যতার শুরু ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়াতেই। আসিরিয়দের সুমের সভ্যতার উত্তরসূরি বলা যেতে পারে।

আক্কাদিয় সভ্যতা প্রায় আসিরিয়দের সমসাময়িক। সেমিটিক জাতি উত্তর

মেসোপটেমিয়া আক্রমণ করে অধিকার করে নেয় ২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সারগন এর নেতৃত্বে। প্রায় ২০০ বছর তাদের ঐ অঞ্চলে প্রতিপত্তি ছিল।

ব্যাবিলন ঃ আক্কাদিয়দের সময়ের ছোট শহর ব্যাবিলন পরে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান শহর ও সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ইরাকের 'হিল্লা' অঞ্চলে ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ১৮৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাবিলন শহরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

অঙ্কোর ভাট ঃ কম্বোডিয়ার খমের রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের তৈরি দ্বাদশ শতকের এই মন্দির সমষ্টি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মনে করা হয়। এই সব হিন্দু দেবদেবীর মন্দির যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তৈরি সেটি এখন ইউনেস্কো ঘোষিত সংরক্ষিত এলাকা।

সেলুসিড ঃ ৩১২ থেকে ৬৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সিরিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল সেলুসিড সাম্রাজ্য। এর রাজধানীর নাম ছিল অ্যান্টিওক।

সেলুকাস নিকাটর ঃ (জন্ম ৩৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-মৃত্যু ২৮১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আলেকজান্ডারের এক সেনাপতি। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর যে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন তাকেই সেলুসিড সাম্রাজ্য বলা হত। ৩০৫-৩০৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পূর্বদিকে (ভারতের উত্তর পশ্চিমে) সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তাঁর এক কন্যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হয়।

রাজা মিদাস ঃ ফ্রিজিয় রাজবংশে অন্ততঃ তিন জন মিদাস নামের রাজার নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত কিংবদন্তির মিদাস, যার নাম থেকে Midas' touch কথাটির উৎপত্তি। গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী ইনি যা কিছু স্পর্শ করতেন তাই সোনা হয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত না খেয়ে মৃত্যু হয় তার। এঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় জন ফ্রিজিয়ার রাজা ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে এবং ইনিই সবচেয়ে বিখ্যাত। তৃতীয় আর একজন মিদাসের নাম পাওয়া যায় ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখাতে।

পার্থিয়া ঃ খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর ধরে ইরানের খোরাসান অঞ্চল থেকে এই শক্তিশালী জাতি তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

মাকিদনিয়া/ম্যাসিডনিয়া ঃ প্রাচীন গ্রিক রাজ্য যেখান থেকে আলেকজান্ডার

তার বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এই রাজ্যের উত্থান খ্রিস্টজন্মের আটশ বছর আগে। সাড়ে ছয়শো বছর পরে অন্তর্কলহে এদের পতন হয়।

সিমেরিয়/কিমেরিয় ঃ ককেশাস অঞ্চলের এক যাযাবর যোদ্ধা জাতি, যারা ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে প্রায় ২৫০ বছর মধ্যপ্রাচ্যের নগরসভ্যতা গুলিকে আক্রমণ ও লুটপাট করে ব্যতিব্যস্ত করেছে। পরে সম্ভবত এরা অন্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গেছে।

আহুরা মাজদা ঃ প্রাচীন ইরানের অগ্নি উপাসক জোরাস্ত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা আহুরা মাজদা। জরাথুষ্ট্র প্রবর্তিত এই ধর্ম একসময় ইরান ছাড়াও এশিয়া মাইনরের অন্যান্য অনেক দেশেও জনপ্রিয় ছিল। ইসলাম ধর্ম আসার পর ধীরে ধীরে এই ধর্ম কোণঠাসা হয়ে যায়। ভারতবর্ষের পার্শি সম্প্রদায় এই ধর্মাবলম্বী।

ঝাং ঝুং/ৎসাং ৎসুং ঃ উত্তর ও উত্তরপশ্চিম তিব্বতের এক প্রাচীন সভ্যতা। কিংবদন্তির খোলস ছাড়িয়ে এখনও এই দেশ ও সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে কৈলাশ ও মানস সরোবর ঝাং ঝুং দেশের অন্তর্গত ছিল এবং এখানকার মানুষদের কাছেও পবিত্র জায়গা ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, ঝাং ঝুং তিব্বতের অংশ ছিল না, এক আলাদা দেশ ছিল যার অধিবাসীরা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ছিল। প্রাচীন বন (বোন) ধর্মের চর্চা হত এখানে। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তারপর সম্ভবত এই সম্পূর্ণ এলাকা তিব্বতের অন্তর্গত হয়ে যায়।

ব্যাকট্রিয়া ঃ গ্রিক সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত ছিল ব্যাকট্রিয়া যা এখনকার আফগানিস্তানে। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর এসব অঞ্চলের গ্রিক শাসকরা স্বাধীন দেশ হিসেবে রাজত্ব চালাত। ২৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অস্তিত্ব ছিল এই সাম্রাজ্যের। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কাশ্মীর ও ইরানের কিছু অংশ নিয়ে ছিল এই বিশাল সাম্রাজ্য।

গান্ধার ঃ প্রাচীনকালে উত্তর পূর্ব পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের এক অংশ নিয়ে গান্ধার রাজত্ব ছিল এরকম ঐতিহাসিকদের ধারণা। পুরাণ ও মহাকাব্যে গান্ধার দেশের কথা পাওয়া যায়। গান্ধারী ছিলেন এই দেশের কন্যা। আধুনিক কান্দাহার নামের উৎপত্তি সম্ভবত গান্ধার থেকে।

দারদিয় : প্রাচীন আর্যভাষা এবং যে সমস্ত মানুষ এই ভাষায় কথা বলত তাদেরও দারদিয় বলা হত। পাকিস্তানের উত্তর পূর্বাঞ্চল, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে দারদিয়দের বসবাস ছিল। আধুনিক কাশ্মীরের অধিবাসীরা এদেরই বংশধর।

একজটা/একজটি : বজ্রযানী বৌদ্ধ তন্ত্রের মহা শক্তিশালী দেবী একজটার উপাসনায় বাধা বিঘ্ন অপসারিত হয়, শত্রুর বিনাশ হয়। দেবীমূর্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে দুই থেকে চব্বিশ হাত দেখা যায়। লোলজিহ্বা, রক্তচক্ষু, নৃমুন্ডমালিনী দেবীর রূপ ভয়ঙ্কর। তিব্বতিরা মনে করে এই দেবী তন্ত্র মতের রক্ষাকর্ত্রী।

উগ্রতারা : হিন্দু তন্ত্রমতের দশমহাবিদ্যার একজন, দেবী ভগবতির এক রূপ। অন্য নাম মাতঙ্গী। দেবীর চার হাত, গলায় মুন্ডমালা। উগ্রতারা দেবীর, একজটার সঙ্গে মিল লক্ষণীয়।

বজ্রভৈরব : বৌধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর রুদ্ররূপ বজ্রভৈরব, যমন্তক বা বটুকভৈরব নামেও পূজিত হন।

পালদেন লাহমো : তিব্বতী বৌদ্ধ তন্ত্রের তিন ধর্মপালের একজন ‘পালদেন লাহমো’ জ্ঞান, বিদ্যার রক্ষাকর্ত্রী হলেও রুদ্ররূপিনী।

রুদ্রচন্ডী : জগতের সব অশুভ শক্তি বিনাশের জন্য দেবী পার্বতীর আর এক রূপ দেবী চন্ডী। তন্ত্র মতে চন্ডীর এক রূপ রুদ্রচন্ডী।

মদেশিয়া/মধেশি : পূর্ব নেপালের সমতলভূমির অধিবাসীদের মদেশিয়া বলা হয়। ভাষা এবং আচার ব্যবহারে উত্তর বিহারের মৈথিলিদের সঙ্গে এদের মিল আছে।

প্রচন্ড : নেপালের মাওপন্থীদের একছত্র নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। ‘প্রচন্ড’ ছদ্মনামে পরিচিত এই রাজনৈতিক নেতার আসল নাম পুষ্পকমল দাহাল।

জোম্বি : হাইতি দ্বীপের কিংবদন্তি অনুযায়ী সেখানকার ‘ভুডু’ ওঝাদের মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে দিয়ে দাসের মতো কাজ করাবার ক্ষমতা আছে। এই চলমান ‘মৃত’ ব্যক্তিদের জোম্বি বলা হয়। এদের নিজস্ব কোন ইচ্ছা বা বাকশক্তি থাকে না।

মাদাম ব্লাভাৎস্কি : হেলেনা পেত্রোভনা ব্লাভাৎস্কি এক রুশ দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে গবেষক। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন যা সে সময়ে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি পেয়েছিল।

এডগার কেস ঃ ইনি একজন প্রখ্যাত ভবিষ্যদদ্রষ্টা ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের অতিপ্রাকৃত বিষয়ে তাঁর লেখা বই আজও জনপ্রিয়।

অনাহিত ঃ অনাহিত প্রাচীন ইরানের উর্বরতা, জল, স্বাস্থ্য ও রোগমুক্তির দেবী। সৈন্যরা যুদ্ধে যাবার আগে অনাহিতর পূজা করত বেঁচে ফিরে আসার আশায়। দেবীর মূর্তিতে দুই হাতে দুই সিংহশাবক দেখা যায়।।

এথিনা ঃ প্রাচীন গ্রিসের যুদ্ধের দেবী। এছাড়া হস্তশিল্প ও নগরের রক্ষাকর্ত্রী দেবী হিসেবে পূজা পেতেন এথিনা।

ভুডু ঃ আফ্রিকার ক্রীতদাসদের সঙ্গে তাদের ধর্ম ও প্রকৃতিপূজক রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান চলে আসে আমেরিকা মহাদেশে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের এবং কিউবাতে। শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টানরা এসবকে ভুডু নাম দেয়।

বজ্রযানী বৌদ্ধ ধর্ম ঃ তন্ত্র ও বৌদ্ধ ধর্মের মিশ্রণে বজ্রযানের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। ভারত ছাড়া তিব্বত, নেপাল ও মঙ্গোলিয়াতে এই ধর্মের অনুসারী আছে।

থেসালি ঃ প্রাচীন গ্রিসের এক অঞ্চল।

মাজদা ইয়াসনা ঃ জরথুস্ত্র প্রচলিত ধর্মকে 'মাজদা ইয়াসনা' বলা হত। আধুনিক পার্শি সম্প্রদায় এই ধর্মমতের অনুসারী।

পশুপতিনাথ ঃ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম পশুপতিনাথ মন্দির হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুকে এই মন্দির অবস্থিত।

স্বয়ম্ভুনাথ ঃ বৌদ্ধ ধর্মের এক তীর্থস্থান ও মন্দির। কাঠমান্ডু উপত্যকায় এক পাহোড়ের উপরে স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির সংলগ্ন আরও অনেকগুলি মন্দির আছে।

গুহ্যেশ্বরী ঃ কাঠমান্ডু শহরে, পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছেই এক সতীপীঠ।

বুড়া নীলকণ্ঠ ঃ কাঠমান্ডুর আর একটি দর্শনীয় ধর্মীয় স্থান। একটি ছোট জলাশয়ে অনন্ত শয়নে শায়িত বিষ্ণু মূর্তি দেখা যায় এখানে।

বৌধা ঃ বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের প্রিয়, কাঠমান্ডুর আর একটি তীর্থস্থান। এখানে একটি বৌদ্ধস্তূপ আছে।

মিথ্র উপাসনা ঃ প্রাচীন ইন্দো-ইরানীয় দেবতা, যাঁর উল্লেখ বেদে আছে 'মিত্র নামে'। জরথুস্ত্রের আগেও ইরান ও সংলগ্ন অঞ্চলে 'মিত্র' পূজা পেতেন আলো, সত্য বা সততা, প্রতিজ্ঞার দেবতা হিসেবে। পরে এঁর নাম হয়ে যায় 'মেহর', যা মিহির বা সূর্যের সঙ্গে সমার্থক। এক সময়ে মিথ্র উপাসনা রোম

সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। রোমান সৈন্যরা মিথ্র দেবের পূজা করত। স্ত্রীলোকদের মিথ্রপূজার অধিকার ছিল না। আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের পর এই ধর্ম লুপ্ত হয়ে যায়।

বন/বোন/পন ধর্ম ঃ তিব্বত, উত্তর ভারত, সিকিম ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রাচীনকালে এই ধর্ম প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। এই ধর্মের অনুসারীদের 'বনপো' বলা হয়। বনপোরা মনে করে বন ধর্মের উৎপত্তি 'তাজিগ' নামক এক স্থানে, কিন্তু তাজিগ ইরানে ছিল না কৈলাশ পর্বতে তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ বন ধর্মাবলম্বী বা গবেষক মনে করেন তাজিগ ছিল প্রাচীন ঝাং ঝুং বা ৎসাং ৎসুং দেশে যার কেন্দ্রে ছিল কৈলাশ পর্বত। কিংবদন্তি অনুযায়ী 'গশেন রাব' বা 'শেনরাব মিও' বুদ্ধ জন্মের ১০৫৫ বছর আগে এই ধর্ম প্রচলন করেন। আবার অনেকের ধারণা তিনি গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক।

অনেকে মনে করেন প্রাগার্য তন্ত্র ধর্ম, যা ইরান ও কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল তার থেকে বন ধর্ম উদ্ভুত। এই ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে এর প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য গবেষকরা বন ধর্মকে মূলত Shamanistic (বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে তার মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেওয়া) বলে থাকে। পরে এই ধর্মের নামে নানা বিকৃত অভিচার ক্রিয়ার মাধ্যমে পূজারিরা মানুষের উপকারের বদলে ক্ষতিও করত। এ সময়ের বন ধর্মকে 'অন্ধকার বন' বা Black bon বলা হয়। পশুবলি এদের ধর্মীয় আচারের এক অঙ্গ ছিল। সম্ভবত বিশেষ বিশেষ কারণে নরবলিও হত। এর ফলে ধীরে ধীরে বন জনপ্রিয়তা হারায়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতের বৌদ্ধ শাসকরা বন ধর্ম শর্তত নিষিদ্ধ করে দেয়। এরপর বৌদ্ধ ধর্মের থেকে অনেক রীতিনীতি গ্রহণ করে সৃষ্টি হয় 'ইউংদ্রুং বন' নামে এক নতুন ধর্মমতের। সম্ভবত বন ধর্মাবলম্বী ও পূজারিরা তাদের ধর্ম রাষ্ট্রের আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্য বৌদ্ধ ধর্মের এক বহিরঙ্গ সৃষ্টি করে। এর ফলে এই সুপ্রাচীন ধর্ম লোপ পায় না। এখনও তিব্বত ছাড়া, ভারতের উত্তরাঞ্চলে, নেপালে ও সিকিমে বন ধর্মাবলম্বীদের পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতকের পর থেকে বন ধর্মের আরও পরিবর্তন হয় এবং এখনকার ধর্মকে 'নতুন বা শ্বেত বন' বলা হয়। এই ধর্মের সঙ্গে বজ্রযানি বৌদ্ধ

ধর্মের মিল আছে। তিব্বতে এখনও প্রায় ২৬২টি বন মনাস্টারি আছে এবং ১০ শতাংশ তিব্বতি আজও বন ধর্মের অনুসারী। সব মিলিয়ে বনপোদের আনুমানিক সংখ্যা এক লক্ষ।

বন ধর্মের পবিত্র চিহ্ন স্বস্তিকা, তবে বামমার্গী। বৌদ্ধ ধর্মের মন্ত্র 'ওম মনিপদ্মে হুম' এর বদলে বনপোদের মন্ত্র হল 'ওম মাতৃমুয়ে সালে দু' যা বিভিন্ন দেবদেবীর নামের আবাহন।

বন ধর্মের প্রচুর দেবদেবী আছে। দেবীদের প্রাধান্য বেশি। বনপোদের মধ্যেও মহিলা পুরোহিত বা পূজারির সম্মান বেশি। বেশ কিছু দেবদেবী বিকটদর্শন ও কারও কারও মিশরীয় দেবতাদের মতো পশুর মুন্ড। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মত বন ধর্মাবলম্বীদের জন্য কৈলাশ পর্বত এক মহা পবিত্র স্থান। দেবদেবীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান **'ইউম'** মাতৃদেবী, সমগ্র বিশ্বজগতের মা। **'লা'** হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। **'সিপা'** হলেন সৃষ্টির দেবতা এবং **'টোনপা'** হলেন শিক্ষক।

